সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০১১

সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা
ও স্বাস্থ্যসেবা
পরিস্থিতি

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান
Campaign for Good Governance

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান-সুপ্র
২/১৯, ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৪৫৬০০; ফ্যাক্স: ৯১৩৯৭৯০
ই-মেইল: info@supro.org
ওয়েবসাইট: www.supro.org

সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০১১

সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতি

গবেষণা, সংকলন ও সম্পাদনা
মৌসুমী বিশ্বাস
কাজী শফিকুর রহমান
সাইফ উদ্দিন আহমেদ
মো. শরিফুল ইসলাম
আবু আলা মাহমুদুল হাসান

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০১২

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৫৪৫৫-৬

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ
অর্ক

প্রকাশক
সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান - সুপ্র
২/১৯, ব্লক বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৯১৪৫৬০০; ফ্যাক্স: ৯১৩৯৭৯০
ই-মেইল: info@supro.org
ওয়েবসাইট: www.supro.org

মূল্য: ৩০০ টাকা

আর্থিক সহযোগিতা: অক্সফাম নভিব

Social Audit Report 2011

Findings of Govt. Primary Education and Health Service

Research, Compilation & Editing
Mousumi Biswas
Kazi shafiqur Rahman
Saif Uddin Ahmed
Md. Shariful Islam
Abu Ala Mahmudul Hasan

Published in
April 2012

ISBN: 978-984-33-5455-6

Design and Printed by
ARKA

Published by
Sushasoner Jonny Procharavizan-SUPRO
2/19 Block- B, Babor Road
Mohammadpur, Dhaka-1207
Phone : +88029145600
Fax: +88029139790
E-mail : info@supro.org
Web: www.supro.org

Price: Tk. 300.00 BDT

Financed by: Oxfam Novib

মুখবন্ধ

সরকারি সেবা বিশেষতঃ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা জন মানুষের কাছে পৌঁছাবে - এটা দেশের জনগণ যেমন আশা করে তেমনি সরকারও তা নিশ্চিত করার জন্য সচেষ্ট থাকে। প্রতিটি সরকারই তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারনামায় এ দুটো খাতকে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু প্রতিবারই আমরা হতাশার সাথে লক্ষ্য করি বাজেটে এ দুটো খাতে তেমন উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ দেয়া হয় না।

বাজেটে শুধু বরাদ্দ বৃদ্ধি নয় পাশাপাশি সম্পদ এবং জনশক্তির যথাযথ বন্টন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে যাচ্ছে অল্পকিছু মানুষজনের কাছে। সরকারি জনবল উধাও হয়ে যাচ্ছে গ্রামাঞ্চল, চরাঞ্চল থেকে। তাই উন্নয়ন প্রচেষ্টা এবং জনবল নিয়োগে গ্রামাঞ্চল, চরাঞ্চল রয়ে যাচ্ছে অবহেলিত। দিন দিন বৈষম্য বাড়ছে। খানা আয় ও ব্যয় সমীক্ষা ২০১০ অনুযায়ী ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে দেশে দারিদ্র্যের হার কমেছে সাড়ে আট শতাংশ। ২০০৫ সালে দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করত ৮০ শতাংশ মানুষ, আর ২০১০ সালে বাস করে ৩১.৫ শতাংশ। তবে দারিদ্র্য যে হারে কমেছে বৈষম্য বেড়েছে তার চেয়েও অনেক দ্রুতগতিতে। দারিদ্র্যসীমার সবচেয়ে নীচে বাস করে যে ৫ শতাংশ মানুষ মোট আয়ে তাদের অংশ মাত্র দশমিক ৭৮ শতাংশ অথচ একই সময় সর্বোচ্চ ধনী ৫ শতাংশের আয় প্রায় ২৫ শতাংশ।

সরকারি বরাদ্দ এবং সরকারি জনবল নিয়োগে জেলা শহরগুলোর সাথে গ্রামের চিত্র বড়ই করুণ এবং হতাশাজনক। অধিকাংশ মানুষের বসবাস যেখানে সেখানে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা কেমন; সেবাদাতা এবং সেবা গ্রহণকারীদের সেবা সম্পর্কে মতামত; সাধারণ মানুষের কাছে সেবা পৌঁছতে মূল বাধাগুলো কি কি সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়ার লক্ষ্যে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান - সুপ্র দেশের ২০ জেলায় জন অভিমতকেন্দ্রিক সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম ২০১১ পরিচালনা করে।

বিগত দুই বছর সুপ্র কর্তৃক দেশের অন্ততঃ ২০ জেলায় সামাজিক জবাবদিহিতা সৃষ্টির এ প্রচেষ্টা কিছুটা হলেও জন সচেতসতা এবং জনঅধিকারবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। সেবাদাতারাও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে অধিক উদ্যোগী হচ্ছেন। সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে সুপ্র এবং অন্যান্য নাগরিক সংগঠনগুলোকে এ জাতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

সামাজিক নিরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০১১ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এই নিরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রতিবেদনটির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।
শ্রদ্ধান্তে-

এম এ কাদের
সাধারণ সম্পাদক
সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান - সুপ্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

স্বাধীনতার ৪০ বছর পেরিয়েছে বাংলাদেশ। এ সময়টায় শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যখাতে আমরা অনেকটা এগিয়েছি। বহুমুখী দারিদ্র্যসূচক, মানবিক উন্নয়ন সূচক, জেন্ডার সমতা সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ উন্নতি করছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পুরষ্কার পেয়েছি আমরা। এমডিজি খাতে যে দেশগুলো এগুচ্ছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। একটি সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের প্রত্যাশায় আমরা যে যার জায়গা থেকে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছি তবে সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে বাজেট প্রণয়ন এবং বাজেট বাস্তবায়নে আমাদের আরো আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন।

সমাজে অধিকার আদায় এবং স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার সংস্কৃতি সৃষ্টির লক্ষ্যে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে শিক্ষা-স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারি যেসব সেবাসমূহ জনগণের পাওয়ার কথা সেগুলো সঠিকভাবে পাচ্ছে কিনা, পেলে সেগুলোর গুণগত মান কেমন, প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান-সুপ্র বাংলাদেশের ২০ (কুড়ি) জেলায় সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। নিরীক্ষা কার্যক্রমের ফলাফল নিয়ে সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০১১ প্রকাশিত হচ্ছে। অনেকের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে কাজটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সুপ্র'র সম্মানিত নির্বাহী ও জাতীয় পরিষদ সদস্যসহ জেলা সম্পাদকবৃন্দকে যাদের সার্বক্ষণিক তদারকিতে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ এবং জেলাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জেলা কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দের প্রতি যারা এই নিরীক্ষা কাজটির সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থেকে সহায়তা করেছেন। মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং জেলা প্রতিবেদন প্রণয়নে সুপ্রর জেলা ক্যাম্পেইন সহায়কগণ প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা শত ব্যস্ততার মাঝেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, অভিভাবক, শিক্ষার্থী, অন্তঃবিভাগ ও বহিঃবিভাগের রোগীদের প্রতি যাদের সহযোগিতা ছাড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্ভবই হতো না।

আমি শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট খান টিপু সুলতান এমপি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র চেয়ারম্যান ডাঃ এম এস আকবর, টিআইবি নির্বাহী পরিচালক ডঃ ইফতেখারুজ্জামান, সাবেক বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মান্না ও বাংলাদেশ উপজেলা পরিষদ এসোসিয়েশনের সভাপতি ফয়েজুর রহমান ফকিরকে যারা ২০ মার্চ ২০১২ - এ অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত থেকে নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি পড়েছেন এবং তৃণমূল মানুষের সুপারিশসমূহ অবগত হয়ে সরকার গৃহিত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করেছেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। আমার সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ যারা প্রতিবেদনের ধারণা পত্র ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন, সম্পাদনা ও সমন্বয়ের কাজ করেছেন। সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০১১ প্রকাশের কাজটি যত্নসহকারে করার চেষ্টা করেছি। তথাপি ভুল-ত্রুটি থাকা বিচিত্র কিছু নয়। ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।
ধন্যবাদসহ,

উমা চৌধুরী
পরিচালক
সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান - সুপ্র

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ৩
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ৪
প্রথম অধ্যায়: প্রেক্ষাপট ৭
দ্বিতীয় অধ্যায়: পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন- প্রাথমিক শিক্ষা চিত্র ১৩
- ১.১ অংশগ্রহণকারীর ধরণ ১৫
- ১.২ আর্থ-সামাজিক অবস্থা ১৫
- ১.৩ বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত অবস্থা ১৫
- ১.৪ জনবল ১৭
- ১.৫ ভর্তি ও ঝরে পড়া ১৭
- কেইস স্টোরি-১ ১৯
- ১.৬ বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ ১৯
- ১.৭ পড়াশুনার গুণগত মান ২১
- ১.৮ শিক্ষার্থীদের প্রণোদনা কার্যক্রম ২২
- ১.৮.ক. উপবৃত্তি ২২
- কেইস স্টোরি-২ ২৩
- ১.৮.খ. মিড-ডে মিল ২৩
- ১.৮.গ. ফিডিং প্রকল্প ২৪
- ১.৯ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা ২৫
- ১.১০ সরকারি মনিটরিং ব্যবস্থা ২৬
- কেইস স্টোরি-৩ ২৭
- সুপারিশ ২৮

তৃতীয় অধ্যায়: পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন- স্বাস্থ্যসেবা চিত্র ২৯
- ২.১ অংশগ্রহণকারীর ধরণ ৩১
- ২.২ জনবল ৩১
- কেইস স্টোরি-১ ৩৩
- ২.৩ আবাসন ব্যবস্থা ৩৪
- কেইস স্টোরি-২ ৩৪
- ২.৪ প্রশিক্ষণ ৩৫
- ২.৫ অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় উপকরণ ৩৫
- ২.৬ সেবার মান ও ফিস্ ৩৯
- সুপারিশ ৪১

চতুর্থ অধ্যায়: উপসংহার ৪৩

প্রথম অধ্যায় ১

প্রেক্ষাপট

প্রেক্ষাপট

৪০ বছর পেরুনো বাংলাদেশ এগোচ্ছে। মানব উন্নয়নের অনেক সূচকে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অনেক দেশের জন্যই উদাহরণ। এগিয়েছে অর্থনীতিও। বাড়ছে প্রবৃদ্ধি, বেড়েছে মাথাপিছু আয়। বাংলাদেশের মানুষ এখন গড়ে আগের চেয়ে বেশী দিন বেঁচে থাকছে। মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে, ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়ার সংখ্যা বেড়েছে। মেয়েরাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছে।

৭০ এর দশকে বাংলাদেশ ছিল পুরোপুরিই সাহায্য নির্ভর একটি দেশ। সাহায্য নির্ভরতা প্রকট হয় আশির দশকের পুরোটা সময়। সামরিক শাসন বাংলাদেশকে পরনির্ভর করতে বড় ধরণের ভূমিকা রাখে। ১৯৮১-৮২ অর্থবছরে বাংলাদেশের নেওয়া মোট বৈদেশিক ঋণ ছিল জিডিপির প্রায় ৬ শতাংশ। এর বিপরীতে সে সময় রপ্তানী আয় ছিল জিডিপি'র সাড়ে ৩ শতাংশের সামান্য বেশী, প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স ছিল আরও কম, প্রায় ২ শতাংশ।

৯০ এর দশকে বাড়তে থাকে বাণিজ্য নির্ভরতা। নব্বইয়ের দশকে সাহায্য নির্ভর বাংলাদেশ বাণিজ্য নির্ভর বাংলাদেশের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল, পরবর্তী দশকে এসে তা অনেকটাই সংহত হয়েছে। ফলে এখন বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্য জিডিপির মাত্র ২ শতাংশ। অন্যদিকে রপ্তানী আয় বেড়ে হয়েছে ১৮ শতাংশ এবং রেমিটেন্স বেড়েছে প্রায় ৯ শতাংশ।

অর্থনীতির চেয়েও বাংলাদেশ বেশি এগিয়েছে মানব উন্নয়নে। ইউএনডিপি মানব উন্নয়ন সূচক তৈরি করছে ১৯৯০ সাল থেকে। সে সময় বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুষ্কাল ছিল ৫৫ বছর ২ মাস। এখন মানুষ গড়ে বাঁচছে ৬৮ বছর ৯ মাস। ১৯৯১ সালেও কম ওজন নিয়ে জন্ম নিত ৬৬ শতাংশ শিশু, সেই সংখ্যা এখন ৪৫। ৯১ সালে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজারে ১৪৬ জন, এখন তা কমে হয়েছে ৫০ জন। ৯১ সালে প্রতি হাজারে ৯২ জন নবজাতক মারা যেত, এখন মারা যায় ৩৯ জন। আর ৯০ এ প্রসূতি মৃত্যুর হার ছিল ১ লাখে ৫৭৪ জন এখন তা কমে হয়েছে ১৯৪ জন।

৪০ বছর ধরে বাংলাদেশে একটি বড় সমস্যা মুদ্রাস্ফীতির চাপ। আয় বৈষম্য বাড়ার একটি অন্যতম কারণ বিভিন্ন সময় মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। কিন্তু সেই প্রবৃদ্ধির সুফল পাচ্ছে না সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ। ৬ শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধির সুফল থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ৪০ বছর পরেও বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক চাহিদা ও মৌলিক মানবাধিকার। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, ”রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন করা যায়: (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা.......”। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও ঘোষণার মাধ্যমে জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করতে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার এবং সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত মানব উন্নয়নের সূচক। সংবিধানের ১৮ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, “জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন এবং জন স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে”।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দে সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষয়টি অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হলেও এই খাত দুটোর প্রধান সমস্যাগুলো সমাধানের বিষয়টি জাতীয় বাজেটে খুব একটা বিবেচনায় নেওয়া হয় না। এছাড়া বরাদ্দকৃত বাজেটের যথাযথ ও কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব থাকায় জনগণের যে ধরণের সেবা পাওয়ার কথা তা পায় না। দেখা যায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার জন্য সরকারিভাবে গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সকল মানুষের তথ্যে অভিগম্যতা না থাকার ফলেও সাধারণ জনগণ সেবা প্রাপ্তি থেকে নিয়মিত বঞ্চিত হচ্ছে।

২০১১-১২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাজেটে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১৮,৬৬৫ কোটি টাকা এবং ঋণ পরিশোধে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মোট বাজেটের ১১% যেখানে অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা ও প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ যথাক্রমে ১২.৪% এবং ৫.৪%। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল থেকে শুরু করে বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার এখনো বিরামহীনভাবে শর্তযুক্ত ঋণ গ্রহণ করে চলেছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সুপারিশে কৃষিখাতসহ অত্যাবশ্যকীয় সেবা খাতের ভর্তুকি হ্রাস করা হচ্ছে যা সাধারণ এবং তৃণমূল জনসাধারণকে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

খাতওয়ারী বাজেট বরাদ্দ বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে বাজেট বরাদ্দ কমেছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৭.২% এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ৬.৮%। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের সুবিধাভোগীর সংখ্যা প্রায় ৪০ লাখের মতো কমেছে। প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় গৃহিত কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে আনা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও দেখা যায় বরাদ্দকৃত সুবিধা প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দিতে বিরাজমান সব রকম দুর্নীতি ও অনিয়মরোধে কার্যকর মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করাও সমানভাবে জরুরি হয়ে পড়েছে।

শিক্ষার গণতন্ত্রায়ণ নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছানো অন্যতম অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। যতদিন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বৈষম্যমূলক থাকবে, যেখানে মুষ্টিমেয় অভিজাতেরা শিক্ষা লাভ করবে ব্যয়বহুল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কিংবা অধিক বরাদ্দের ক্যাডেট কলেজে, অথচ বেশিরভাগ মানুষ পাবে নিম্নমানের শিক্ষা, ততদিন আমাদের সামাজিক বৈষম্য বাড়তেই থাকবে। পৃথিবী ক্রমেই যত জ্ঞানভিত্তিক হয়ে উঠছে, ততই শিক্ষার অসম অধিকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতার অন্যতম শক্তিশালী উৎস হিসেবে আভির্ভূত হচ্ছে।

আমাদের দেশের বিদ্যমান স্বাস্থ্যব্যবস্থা এখন অনেকাংশেই রাজধানী নির্ভর, শহর নির্ভর। কিন্তু স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো দরকার মানুষের দোড়গোড়ায়। সাধারণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় ও প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা দেওয়া হবে গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র থেকেই। সেই সঙ্গে থাকবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা। একটি নির্দিষ্ট স্থানের অধিবাসীদের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকবে যেখানে স্বাস্থ্যকর্মী ছাড়াও স্থানীয় জনগণ সম্পৃক্ত থাকবে। প্রয়োজন অনুযায়ী রোগীকে রেফার করা হবে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখানে সম্ভব না হলে উপজেলায় আর তারপর জেলা পর্যায়ে। চিকিৎসার জটিল সেবাগুলো জনগণ যাতে জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমেই পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। যেগুলো একদম ব্যয়বহুল এবং গবেষণার স্তরে আছে, শুধু সেসবের জন্যই মানুষকে যেতে হবে রাজধানীতে।
আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ যারা গ্রামে গঞ্জে বসবাস করে, ফসল উৎপাদন করে মূলত তাদের অবদানের ফলেই আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে অথচ সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে তারা সবচাইতে পিছিয়ে। সরকারি অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ যাতে তাদের প্রাপ্য সেবা পায় সেজন্য নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান- সুপ্র দেশের ২০ জেলায় জনমত জরিপভিত্তিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

সামাজিক নিরীক্ষার যৌক্তিকতা

দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণের অধিকার বিশেষত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারি যে সব সেবাসমূহ জনগণের পাওয়ার কথা সেগুলো সঠিকভাবে পাচ্ছে কি না, পেলে সেগুলোর গুণগত মান কেমন, প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করে সুপ্র। সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম জনস্বার্থ রক্ষা, দুর্নীতি হ্রাস, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং তথ্য অধিকার আইনকে তৃণমূলের জনগণের কল্যাণার্থে কার্যকর করার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে জনগণের কাছে প্রতিভাত হয়। সামাজিক নিরীক্ষা একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যার মাধ্যমে সেবাগ্রহণকারী এবং সেবাদাতার সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারি সেবার পর্যাপ্ততা, মান, দূর্বলতা এবং সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত জানা সম্ভব হয়েছে।

সামাজিক নিরীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরাজমান সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;
- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা ও কর্মমান নিরূপণ করা;
- দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ তৈরি করা;
- প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে এলাকার জনগণের মধ্যে সচেতনতা ও জনমত তৈরি করা;
- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মমান উন্নীতকরণে অধিপরামর্শ (advocacy) করা।

নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতাভূক্ত ভৌগলিক এলাকা

সুপ্র তার নেটওয়ার্কের আওতাভূক্ত ৪৫ জেলার মধ্যে ২০ জেলায় নিরীক্ষা কার্যক্রম চালিয়েছে। জেলাগুলো হলো: কুমিল্লা, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, চট্টগ্রাম, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর, নাটোর, নেত্রকোনা, নোয়াখালী, পাবনা, বগুড়া, বরগুনা, ময়মনসিংহ, রাজবাড়ী, রাজশাহী, রাঙ্গামাটি, শরীয়তপুর এবং সাতক্ষীরা।

শিক্ষা সম্পর্কিত নিরীক্ষাভূক্ত কর্ম এলাকার জেলা পর্যায় থেকে জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিস, জেলা পর্যায়ের ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপজেলা পর্যায়ের ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের ২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সদর এলাকা, সদর এলাকার নিকটবর্তী বিদ্যালয় এবং প্রত্যন্ত এলাকার বিদ্যালয় বিবেচনা করা হয়েছে।

একইভাবে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নিরীক্ষায় জেলা পর্যায় থেকে ১টি সদর হাসপাতাল, উপজেলা পর্যায় থেকে ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন পর্যায় থেকে ১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক নির্ধারণ করা হয়েছে।

উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

এই নিরীক্ষা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ উপাত্ত সরাসরি মাঠ পর্যায়ের উত্তরদাতার (সেবাদাতা এবং সেবাগ্রহীতা) কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে সাক্ষাৎকার, এফডিজি ও কেইস স্টোরির মাধ্যমে; পরোক্ষ উপাত্ত উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে বিভিন্ন বই, হাজিরা খাতা, লেজার বই, লগ সিট, প্রতিবেদন, পরিকল্পনা পত্র, রেজিষ্ট্রার খাতা ইত্যাদি থেকে নেয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে জেলাভিত্তিক পৃথক পৃথক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। পাশাপাশি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত কম্পিউটার বেজড সফটওয়ার ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সামাজিক নিরীক্ষা কাজের সীমাবদ্ধতাসমূহ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে এখনও পুরোপুরি সচেতনতা তৈরি না হওয়াতে কেউই তথ্য প্রদানে খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেননি। অনেকক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ সত্ত্বেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কিছু কর্মচারি গোপনীয়তার দোহাই দিয়ে তথ্য দিতে চান নি। বিশেষ করে বাজেট সম্পর্কিত তথ্য দিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ অনীহা প্রকাশ করেছেন।

পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন:
প্রাথমিক শিক্ষা চিত্র

পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন: প্রাথমিক শিক্ষা চিত্র

১.১ অংশগ্রহণকারীর ধরণঃ

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য মূলত দুই ধরণের ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথমত, সেবাদাতা যারা প্রাথমিক শিক্ষাসেবা প্রদানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত যেমন, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি। দ্বিতীয়ত, সেবা গ্রহিতা যারা প্রাথমিক শিক্ষাসেবা গ্রহণ করছে। এদের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী, তাঁদের অভিভাবকবৃন্দ এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধি যারা প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখেন ও শিক্ষাসেবা উন্নয়নকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সেবাদাতাদের তথ্য মূলত ১৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। মোট ১৭৩ জন তথ্যদাতার সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ১৬.২ শতাংশ, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ১২.১ শতাংশ, শিক্ষক ৩৭.৬ শতাংশ, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৩১.৮ শতাংশ এবং অন্যান্য ২.৩ শতাংশ। উত্তরদাতার মধ্যে ৬৪.৫ শতাংশ পুরুষ এবং ৩২.৩ শতাংশ নারী।

সেবা গ্রহিতার ক্ষেত্রে মোট ২২৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যার মধ্যে ২৪.৯ শতাংশ জেলা, ১৮.৮ শতাংশ উপজেলা এবং সর্বাধিক ৫৬.৩ শতাংশ রয়েছে ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেবা গ্রহিতা মোট ৩৬৭ জনের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যার মধ্যে ১৮৯ জন অভিভাবক (৫১.৫%) এবং ১৭৮ জন (৪৮.৫%) নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি। অংশগ্রহণকারী মোট উত্তরদাতার ৬৭.৫ শতাংশ পুরুষ এবং ৩২.৫ শতাংশ নারী।

১.২ আর্থ-সামাজিক অবস্থা ঃ

সমীক্ষার ক্ষেত্রে মূলতঃ সেবা গ্রহিতা যারা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সেবা গ্রহণ করছে তাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের হার তুলনামূলক বেশি। যারা উচ্চবিত্ত তারা কিন্ডারগার্টেনসহ অন্যান্য বেসরকারি যেমন প্রি-ক্যাডেট থেকে শিক্ষা সেবা গ্রহণ করে থাকে যেখানে শিক্ষা উপকরণ, অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলক অনেক বেশি।

সমীক্ষায় দেখা যায় যে, মোট উত্তরদাতার মধ্যে সর্বাধিক ৫৫ শতাংশের মাসিক পারিবারিক আয় ৫,০০০-১০,০০০ টাকার মধ্যে। বাকিদের মধ্যে ৩৫.১ শতাংশের পারিবারিক আয় ৫০০০ টাকার নিচে এবং মাত্র ৯.৯ শতাংশের মাসিক পারিবারিক আয় ১০,০০০ টাকার উপরে। সমীক্ষায় দেখা যায়, অধিকাংশ পরিবারই আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য তৈরি করতে পারছেনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা সঞ্চয় করতে পারছেনা। উত্তরদাতার প্রায় ৫৫.৪ শতাংশই তাদের পরিবারের মাসিক ব্যয় ৫,০০০-১০,০০০ টাকার মধ্যে বলে মত প্রকাশ করেছেন। বাকিদের মধ্যে ৩৬.২ শতাংশ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাদের মাসিক ব্যয় ৫,০০০ টাকার নিচে এবং ৮.৫ শতাংশ ব্যয় করছেন ১০,০০০ টাকার উপরে।

১.৩ বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত অবস্থা

অবকাঠামো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টির পিছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও সমীক্ষায় দেখা যায় যে, অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই। ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মতে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো সন্তোষজনক নয়। মোট উত্তরদাতার মাত্র ৯.৬ শতাংশ অবকাঠামো সম্পর্কে তাদের খুব সন্তুষ্টির কথা বলেছেন, যেখানে ৩২.৮ শতাংশ সন্তুষ্ট ৩৩.২ শতাংশ অল্প সন্তুষ্ট এবং

২৪.৪ শতাংশ সরাসরি অসন্তুষ্ট বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিদ্যালয়ের পাঠদান কক্ষ ছাত্র-ছাত্রী অনুযায়ী যথেষ্ট উপযুক্ত এবং মানসম্মত নয় বলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণ মনে করেন। অনেকের মতে, একটি শ্রেণী কক্ষে ১৭ জন থেকে শুরু করে ১৩৭ জন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীকে একসাথে পাঠগ্রহণ করতে হয়। শ্রেণী কক্ষ ছাড়াও অন্যান্য অবকাঠামো হিসেবে বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ, শৌচাগার, টিউবওয়েল ইত্যাদির উপর তারা আলোকপাত করেন। ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকগণ মনে করেন, বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ না থাকা, মাঠ থাকলেও খেলাধুলার উপযোগী না হওয়া, খেলার মাঠে বর্ষাকালসহ বছরের অধিকাংশ সময় পানি জমে থাকা ইত্যাদি ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবিকাশের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা টিউবওয়েলের পানি পান করলেও কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে পুকুরের পানি ব্যবহার এবং কিছু বিদ্যালয়ে কোন টিউবওয়েল না থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। মোট অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতার ৮৫ শতাংশ বলেছেন তারা বিদ্যালয়ের নিজস্ব টিউবওয়েল থেকে পানি ব্যবহার করেন, যেখানে ৭.২ শতাংশ বলেন তারা বিদ্যালয়ের বাইরের টিউবয়েলের পানি ব্যবহার করেন। টিউবওয়েলের পরিবর্তে পুকুরের পানি ব্যবহার করেন এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ৩.৩ শতাংশ যেখানে ৩.৯ শতাংশ উত্তরদাতা তাদের বিদ্যালয়ে খাবার পানির কোন ব্যবস্থা নেই বলে মত প্রকাশ করেন।

ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো নিয়ে সন্তুষ্টি			
খুব সন্তুষ্ট	সন্তুষ্ট	অল্প সন্তুষ্ট	অসন্তুষ্ট
৯.৬%	৩২.৮%	৩৩.২%	২৪.৪%

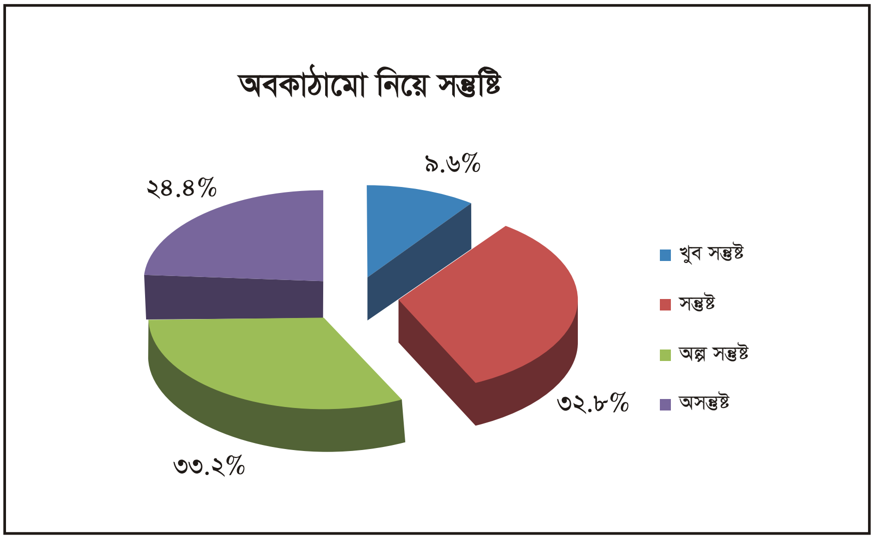

অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শৌচাগার থাকলেও অনেকক্ষেত্রে সেগুলো স্বাস্থ্যসম্মত নয়। কখনো কখনো ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগার থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের একই শৌচাগার ব্যবহার করতে হয়। এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদেরও একই শৌচাগার ব্যবহার করতে হয়। আবার কিছু বিদ্যালয়ে শৌচাগারের কোন ব্যবস্থাই নেই বলে সমীক্ষায় দেখা গেছে। মোট উত্তরদাতার ৩.৪ শতাংশ বলেন, তাদের বিদ্যালয়ে কোন শৌচাগার নেই, বাকি উত্তরদাতার ৫৫.৮ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য আলাদা শৌচাগার থাকার কথা বললেও ৪০.৮ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন, তারা ছেলে এবং মেয়েরা একই শৌচাগার ব্যবহার করেন। উত্তরদাতার ৪৯.৩ শতাংশ মনে করেন তাদের শৌচাগার স্বাস্থ্যসম্মত। ৭০.৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন, তাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য

আলাদা শৌচাগার রয়েছে, যেখানে ২৯.৪ শতাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য একই শৌচাগার ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন। সমীক্ষায় ৮১.৬ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, শৌচাগারগুলো প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবহার উপযোগী নয়।

১.৪ জনবল

সুপ্র পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষার যথাযথ মান নিশ্চিতকরণ, ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি নিবন্ধন, শিক্ষা কারিকুলাম বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রীর মনোবিকাশে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, বিদ্যালয় বহির্ভূত কোচিং বন্ধসহ প্রাথমিক শিক্ষা গুণগত বিকাশের ক্ষেত্রে জনবল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সেবাপ্রদানকারী অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গই মনে করেন, সঠিক জনবলের অভাবে শিক্ষার গুণগতমান বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছেনা।

জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকতাদের অনেকেই মনে করেন শিক্ষা কার্যক্রম তদারকি করার জন্য যথেষ্ঠ জনবল নেই। ১২২ জন উত্তরদাতার ৫৮.২ শতাংশ মনে করেন জনবলের ঘাটতি রয়েছে, যেখানে ৪১.৮ শতাংশ মনে করেন যে জনবল রয়েছে তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথেষ্ঠ। প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে অধিক গতিশীল এবং বস্তুনিষ্ঠ করতে নতুন পদ সৃষ্টি এবং জনবলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন ৮৩.৮ শতাংশ উত্তরদাতা। ১৬৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩২.৭ শতাংশ মনে করেন বিদ্যালয়ে পাঠদান করার জন্য যথেষ্ঠ সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে যেখানে ৬৭.৩ শতাংশ বলেন, শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা অপ্রতুল।

বিদ্যালয়ে পাঠদান করার জন্য যথেষ্ঠ সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে কি না সে বিষয়ে সেবাদাতার মতামত	
যথেষ্ঠ সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা অপ্রতুল
৩২.৭%	৬৭.৩%

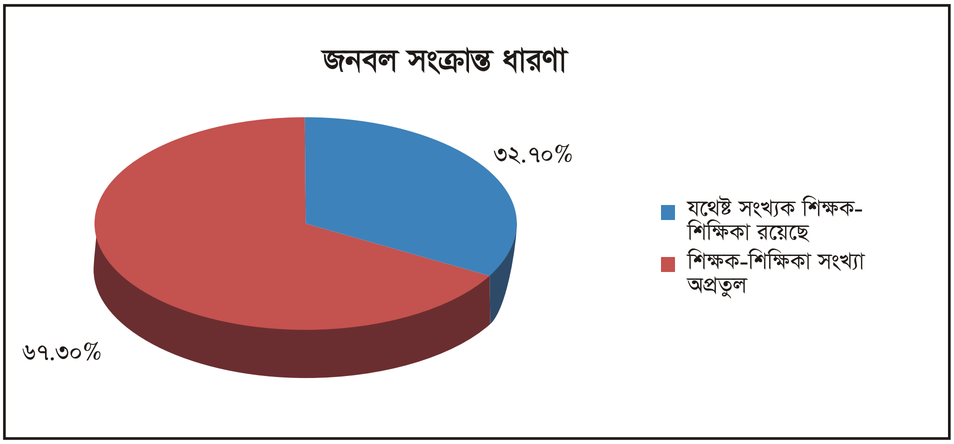

১.৫ ভর্তি ও ঝরে পড়া

প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা সরকার বারংবার বললেও বাস্তবতা ভিন্ন। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে অন্যতম হলো ২০১২ সালের মধ্যে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং ২০১৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা। অন্যদিকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্তকরণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ২০১১ সালে এসেও প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ হয়নি।

নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৩৪৬ জন অভিভাবকের মধ্যে ৯১.৯ শতাংশ জানিয়েছেন যে তাদের সন্তান নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায়, অন্যদিকে ৮.১ শতাংশ অভিভাবক জানিয়েছেন তাদের সন্তানেরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় না। কারণ হিসেবে তারা দারিদ্র্য, বিদ্যালয়ের দূরত্ব এবং বাড়িতে কাজের চাপকেই প্রধাণত দায়ী করেছেন। উত্তরদাতা ৯৩ শতাংশই মনে করেন দারিদ্র্য এখানে মূল ভূমিকা রাখছে। যেখানে ৫ এবং ২ শতাংশ দায়ী করেছেন যথাক্রমে বিদ্যালয়ের দূরত্ব এবং বাড়িতে কাজের চাপকে।

ছেলেমেয়েরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণ হিসেবে অভিভাবকদের অভিমত		
দারিদ্র্যের কারণে	বিদ্যালয়ের দূরত্ব বেশী হওয়ার কারণে	বাড়িতে কাজের চাপের কারণে
৯৩%	৫%	২%

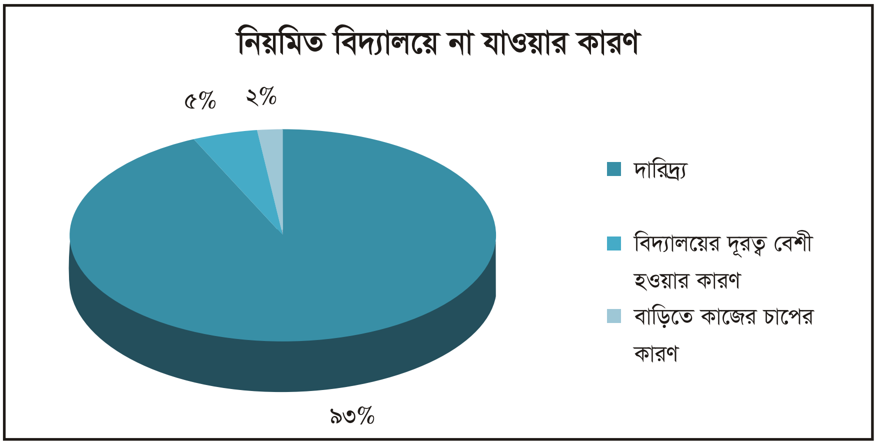

তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এফজিডি'র মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহে দেখা যায় যে, তাদের এলাকায় তাদের সমবয়সী অনেকেই বিদ্যালয়ে যায়না। কারণ হিসেবে উঠে আসে,যে, অনেক ছেলে-মেয়েই পর্যাপ্ত খাবার পায়না। অনেক ছাত্র-ছাত্রী অন্যের বাসায় কাজও করে। অনেক ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েরা ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্যালয়ে যায় না। ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযোগ করে, অনেক সময় দরিদ্র বাবা-মায়েরা ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে চায়না। এক্ষেত্রে ছেলে থেকে মেয়েদের উপর বেশি বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় বলে ছাত্র-ছাত্রীরা উল্লেখ করে। তবে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ৯৫ শতাংশ সেবাদানকারী। এক্ষেত্রে ৯২.৫ শতাংশ মনে করছেন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে।

সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আনন্দ স্কুল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। আনন্দ স্কুলের কার্যক্রম ঝরে পড়া শিশুদের স্কুলমুখী করতে পেরেছে কিনা এটিও সামাজিক নিরীক্ষার অন্যতম একটি লক্ষ্য ছিলো। এক্ষেত্রে ৪৬.৫ শতাংশ সেবাদানকারী মনে করছেন, আনন্দ স্কুল ঝরে পড়া শিশুদের স্কুলে আনার জন্য আগ্রহী করতে পেরেছে। অপরদিকে ৫৩.৫ শতাংশ উত্তরদাতা ভিন্নমত প্রদান করেছেন। তারা মনে করেন, ঝরে পড়া শিশুদের স্কুলে আনার ক্ষেত্রে আনন্দ স্কুল আগ্রহী করতে পারেনি। এক্ষেত্রে ৪২ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, আনন্দ স্কুল কার্যকর ভূমিকা রাখছে, তবে ৫৮ শতাংশ মনে করেন, আনন্দ স্কুল কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।

ঝরে পড়া শিশুদের স্কুলে আনার ক্ষেত্রে আনন্দ স্কুল আগ্রহী করতে পারছে কি না সে বিষয়ে সেবাদাতাদের অভিমত	
আগ্রহী করতে পারছে বলে মনে করেন	আগ্রহী করতে পারছে না বলে মনে করেন
৪২%	৫৮%

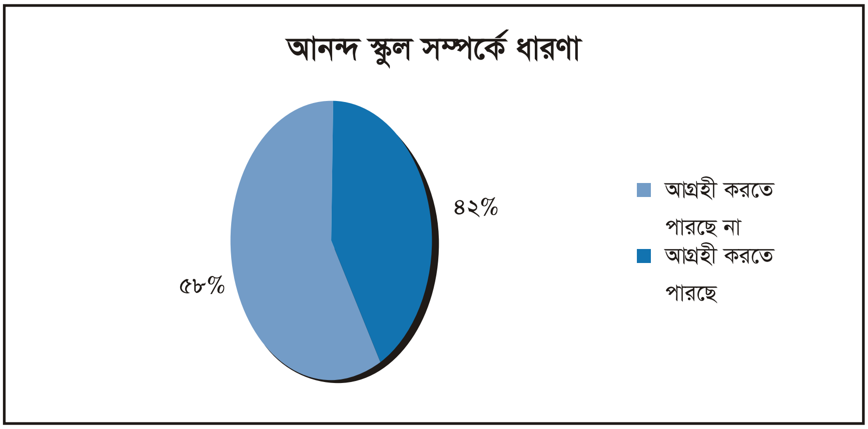

কেইস স্টোরি-১

শিমুর পড়াশুনার প্রবল আগ্রহ মেটালো আনন্দ স্কুল

কুষ্টিয়ার চর আমলাপাড়ার সীমা বেগমের মেয়ে সুমাইয়া পারভীন শিমু। বয়স ১২ বছর। শিমু তার বাবাকে হারিয়েছে খুব ছোটবেলায়। শিমুরা দুই ভাই, দুই বোন। শিমু সবার ছোট। স্বামীর মৃত্যুর পর সীমা বেগম তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে আসেন বাবার বাড়ী। তিনি বাসা বাড়ীতে কাজ করে বা কখনো হোটেলে কাজ করে সংসার চালাতেন। অভাবের কারণে শিমুর ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা বঞ্চিতই থেকে গেল। এভাবে দিন যায়। কিছুদিন হল শিমুর বড় ভাই বিয়ে করেছে। সে বউ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে। বড় বোনটি শ্বশুর বাড়ীতে এবং ছোট ভাই হোটেলে কাজ করে। শিমুর পড়াশুনার আগ্রহ প্রবল। সে কারণে সীমা বেগম তাকে আনন্দ স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। দুই বছর হলো আনন্দ স্কুলে পড়ছে সে। তার স্বপ্ন সে একদিন ডাক্তার হবে। গরীব মেহনতি মানুষের চিকিৎসা সেবা দিবে।

১.৬ বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য সবার জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ এবং বিনামূল্যে পাঠদান। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় ৬ বছরের উপরে সকল শিশুকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিবেচ্য বিষয়। বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা এবং শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকার ২০১০ সাল হতে মাধ্যমিক পর্যায়েও বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। শিক্ষাবর্ষ বিবেচনায় প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে শিক্ষার্থীদের নতুন বই প্রদান করা হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে সফলতা এবং শিক্ষার্থীদের একাগ্রতা অনেকাংশে পাঠ্যবই প্রাপ্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। বিনামূল্যে সঠিক সময়ে পাঠ্যবই বিতরণের কথা থাকলেও সুপ্র পরিচালিত নিরীক্ষায় সেখানেও কিছু অসংলগ্নতা উঠে এসেছে।

শিক্ষাসেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সঠিক সময়ে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রদানের কথা বললেও ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের বক্তব্যে কিছু অসংলগ্নতা লক্ষ্য করা যায় যদিও অধিকাংশই সঠিক সময়ে বিনামূল্যে নতুন বই প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেন। সেবা প্রদানকারী ৮৭.৫ শতাংশই মনে বলেন, ডিসেম্বর মাসেই কেন্দ্র থেকে বই

সংশ্লিষ্ট জেলায় প্রেরণ করা হয়। কেন্দ্র থেকে বই প্রাপ্তির ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যেই জেলা থেকে উপজেলায় বই সরবরাহ করা হয় বলে মত প্রকাশ করেন ৭০.৬ শতাংশ উত্তরদাতা। তবে ২৯.৪ শতাংশ উত্তরদাতা দাবী করেন, কেন্দ্র থেকে বই প্রাপ্তির ১ থেকে ৭ দিনের মধ্যেই জেলা থেকে উপজেলায় বই সরবরাহ করা হয়।

সেবা প্রদানকারীদের এসব বক্তব্যের সাথে অনেকটা একমত হলেও ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকগণ ভিন্নমতও পোষণ করেন। নিরীক্ষায় অংশ নেয়া ৯৬.১ শতাংশ উত্তরদাতা বই বিনামূল্যে সঠিক সময়ে পাওয়ার কথা জানালেও ৩.৯ শতাংশ উত্তরদাতা বই না পাওয়ার কথা জানান।

সঠিক সময়ে বিনামূল্যে বই পাওয়া প্রসঙ্গে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের অভিমত

সঠিক সময়ে বিনামূল্যে বই পাওয়া যায় বলে মনে করেন	সঠিক সময়ে বিনামূল্যে বই পাওয়া যায় না বলে মনে করেন
৯৬.১%	৩.৯%

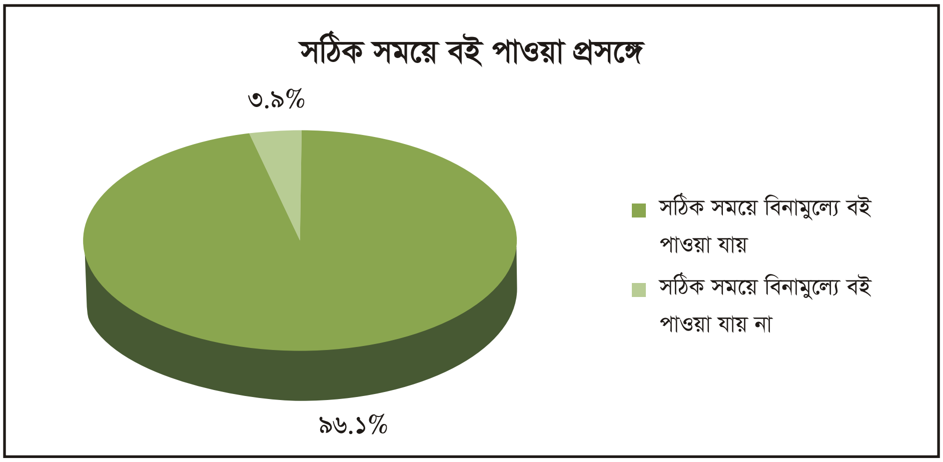

বই না পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ করেছেন কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ৯২.৫ শতাংশ কোন অভিযোগ করেন নি বলে জানান। যারা অভিযোগ করেছেন এমন ৯৫ জনের মধ্যে ৮৪.২ শতাংশই বলেছেন তারা কোন সুরাহা পাননি। বাকি ১৫.৮ শতাংশ বলেছেন তারা ইতিবাচক ফল পেয়েছেন। ২৮৯ জন উত্তরদাতার ১২.৫ শতাংশ অভিযোগ করেছেন যে তারা বই নিতে টাকা দিয়েছেন। উত্তরদাতাদের ৬৩.২ শতাংশ বলেছেন ১০ টাকা, ২১.১ শতাংশ বলেছেন ২০ টাকা, ১০.৫ শতাংশ বলেছেন ৪০ টাকা এবং ৫.৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন বই নিতে তাদেরকে ৩৫ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। অভিভাবকদের অভিযোগ সম্পর্কে সেবা প্রদানকারীদের ১৫৯ জনের মধ্যে ১০.১ শতাংশ হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত জানতে এফজিডি করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ বলেন, তারা জানুয়ারি মাসেই নতুন বই বিনামূল্যে পেয়েছেন। তবে কেউ কেউ অভিযোগ করেছে বই পেতে তাদের ১০ টাকা দিতে হয়েছে। তবে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই সঠিক সময়ে বই পেয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছে।

১.৭ পড়াশুনার গুণগত মান

শিক্ষা একটি জাতির জন্য যেমন অত্যাবশ্যকীয়, তেমনি শিক্ষার গুণগত মান রক্ষা করাও অত্যন্ত জরুরি। শুধুমাত্র সংখ্যাগত সফলতা নয়, শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। গুণগত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষকের দক্ষতা, পাঠদানের কৌশল, পাঠ্যবহির্ভূত শিক্ষাকার্যক্রম, খেলাধুলা ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত।

সুপ্র পরিচালিত সামজিক নিরীক্ষায় পড়াশুনার গুণগত মান বিষয়ে সেবা প্রদানকারী এবং সেবা গ্রহীতা উভয় ক্ষেত্র থেকে শিক্ষার মান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সেবা প্রদানকারীদের তথ্য অনুযায়ী শিক্ষার মান উন্নয়নকল্পে নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং শিক্ষার মান এখন যথেষ্ঠ মানসম্মত।

উত্তরদাতা ১৫২ জনের মধ্যে ৭২.৪ শতাংশ বলেছেন শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত পদক্ষেপ হিসেবে স্কুল কোচিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও ২৭.৬ শতাংশ বলেছেন তাদের বিদ্যালয়ে এমন কোন ব্যবস্থা নেই। পাঠ্যবহির্ভূত শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১২৫ জন সেবাদাতার মধ্যে ৮৬.৮ শতাংশ বলেছেন তাদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত চারু-কারু ক্লাস নেয়া হয় এবং ১১৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭৯.৯ শতাংশ বলেছেন তাদের বিদ্যালয়ে খেলাধুলার উপকরণ দেয়া হয়। তবে এই বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে মিশ্র মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। ৩৩৭ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১১.৬ শতাংশ বলেছেন খুব ভাল, সর্বাধিক ৭৮.৯ শতাংশ বলেছেন ভাল এবং ৯.৫ শতাংশ বলেছেন ভাল নয়। এক্ষেত্রে অনেকেই শিক্ষকদের পাঠদানের মান নিয়ে প্রশ্ন করেন।

পাঠ্যবহির্ভূত শিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অভিমত		
খুব ভালো	ভাল	ভাল নয়
১১.৬%	৭৮.৯%	৯.৫%

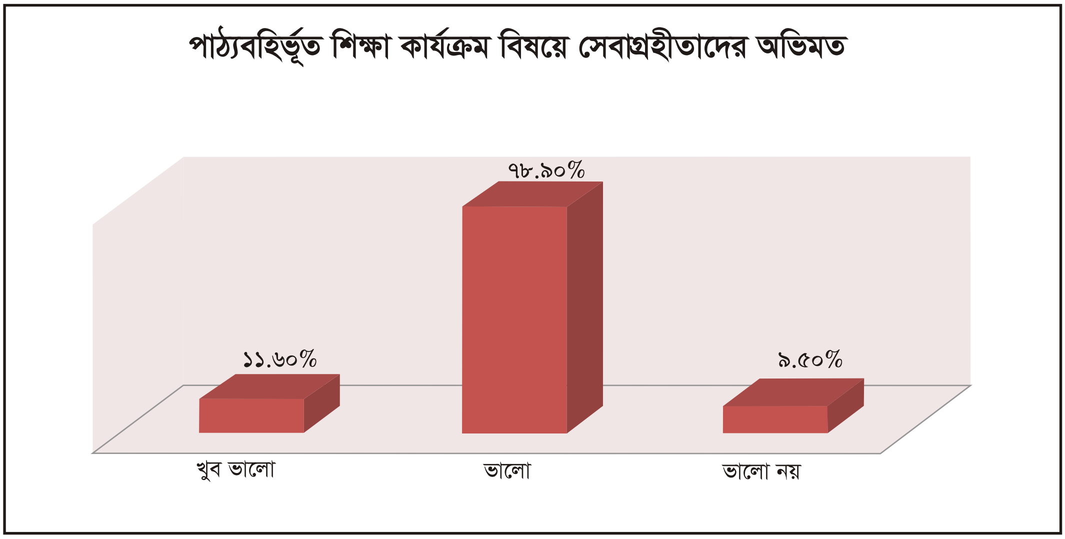

মোট ৩১৫ জন উত্তরদাতার ৭৬.৪ শতাংশ শিক্ষকের পাঠদানের মান সন্তোষজনক বললেও ২৩.৬ শতাংশ উত্তরদাতা তাদের মান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। শিক্ষার মানোন্নয়নে বিদ্যালয়ে কোচিং বিষয়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, বিদ্যালয়ে যে কোচিং করা হয়, তার বিনিময়ে টাকা

দিতে হয়। অধিকাংশ উত্তরদাতা অভিযোগ করেছেন, বিদ্যালয়ে প্রাইভেট পড়ানো হয় এবং ছাত্র ভেদে ২০০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। তবে অনেকে ভিন্নমত প্রকাশ করে বলেছে, তাদের বিদ্যালয়ে কোচিং করানো হলেও টাকা নেয়া হয়না।

শিক্ষকের পাঠদানের মান নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের অভিমত	
মান সন্তোষজনক বলে মনে করেন	মান সন্তোষজনক নয় বলে মনে করেন
৭৬.৪%	২৩.৬%

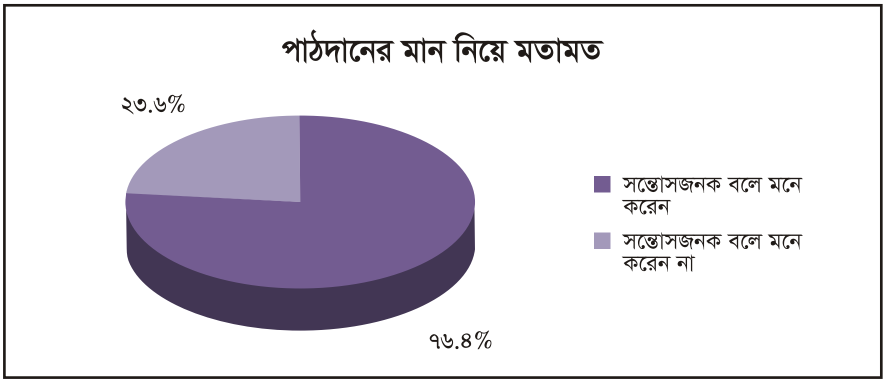

১.৮ শিক্ষার্থীদের প্রণোদনা কার্যক্রম

বর্তমান সরকার শিক্ষা কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনাপূর্বক শিক্ষাখাতে বেশ কিছু প্রণোদনা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকারের ধারণা, গৃহিত প্রণোদনা কার্যক্রমের ফলে শিক্ষার মানোন্নয়নসহ প্রাথমিক শিক্ষায় গতিশীলতার পাশাপাশি ঝরে পড়ার হার হ্রাস করা সম্ভব হবে। সরকারের গৃহিত এসব পদক্ষেপসমূহ এবং এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন ছিলো সুপ্র পরিচালিত সামাজিক নিরীক্ষার অন্যতম একটি লক্ষ্য।

১.৮.ক. উপবৃত্তি

সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সরকার গৃহিত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে উপবৃত্তি কার্যক্রম অন্যতম। দেশের আপামর জনগণের দারিদ্র্যকে বিবেচনা করে শিশুর ঝরে পড়া হ্রাস এবং শিশুকে বিদ্যালয়মুখি করতে সরকারের এই পদক্ষেপ। সরকারের এই পদক্ষেপের আওতায় দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রী এমনকি দরিদ্র ও মেধাবীরা আসছে না বলে মত প্রকাশ করেছেন সেবা প্রদানকারী এবং সেবা গ্রহীতা উভয়ই। সেবা প্রদানকারী মোট ১০৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭০.২ শতাংশ মত প্রকাশ করেছেন, দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা এই কার্যক্রমের বাইরে থাকছে। অন্যদিকে সেবা গ্রহীতা ২৬১ জনের মধ্যে ৪২.৯ শতাংশ বলছেন তাদের সন্তানেরা উপবৃত্তি পাচ্ছেনা, বাকি ৫৭.১ শতাংশ বলছেন তাদের সন্তানেরা এই সুবিধা পাচ্ছে। তবে ২১৭ জন অভিভাবকের মধ্যে ৮৬.৬ শতাংশ মনে করেন, উপবৃত্তির টাকা যথেষ্ঠ নয় এবং ১০৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯৪.৫ শতাংশই এই উপবৃত্তি বৃদ্ধির পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

উপবৃত্তির টাকা যথেষ্ট কি না সে সম্পর্কে অভিভাবকদের অভিমত	
উপবৃত্তির টাকা যথেষ্ট বলে মনে করেন	উপবৃত্তির টাকা যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন
১৩.৪%	৮৬.৬%

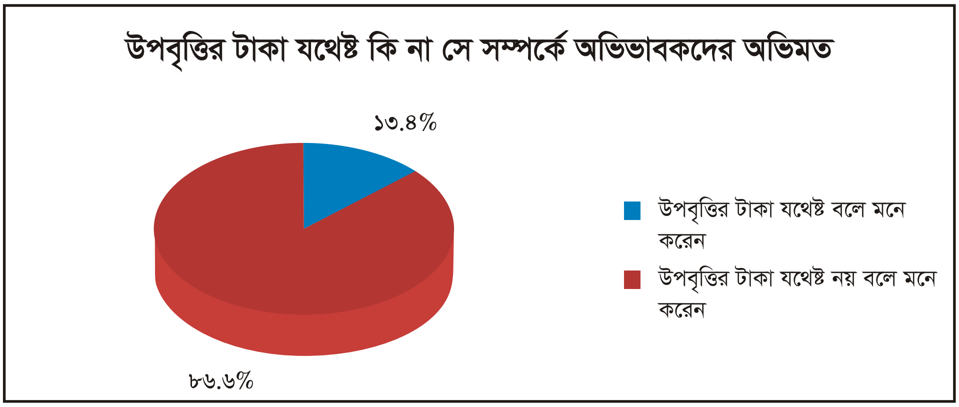

তবে উপবৃত্তি শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখলেও এর পরিধি না বৃদ্ধির পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন অধিকাংশ সেবা প্রদানকারী। ১৪১ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯০.৮ শতাংশই মনে করেন উপবৃত্তি শিক্ষার মানোন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। তবে তারা এর আওতা বৃদ্ধি করার পক্ষে নয়। তাদের মতে, উপবৃত্তি প্রদান করায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ১৩০ জন সেবা প্রদানকারীর ৯৫.৪ শতাংশ মনে করেন শিক্ষার মানোন্নয়নে উপবৃত্তির আওতা বৃদ্ধি করা উচিৎ নয়। তবে শিক্ষকদের ৭৫.৫ শতাংশ মনে করেন উপবৃত্তির কারণে তারা সঠিক ভাবে ক্লাস নিতে পারেননা, ৬০.৬ শতাংশ মনে করেন যে এটা তাদের জন্য বাড়তি পরিশ্রম, ২২.৩ শতাংশ বলেন এতে শিক্ষাদানে অনাগ্রহ তৈরি হয়।

কেইস স্টোরি-২

উপবৃত্তির টাকায় বুক সেলফ, ছাতা ও চেয়ার কিনেছে তাহমিনা

টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বাঘবাড়ী-চৌবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রী তাহমিনা আক্তার। তাহমিনার বাবা মোঃ শরীফুল ইসলাম ঢাকায় সোয়েটার ফ্যাক্টরীতে কাজ করেন। ৫ সদস্যের পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম তাহমিনার বাবা সংসার চালান অতি কষ্টে। তাহমিনা স্কুল থেকে উপবৃত্তি পায়। এ বছর উপবৃত্তির টাকায় সে খাতা, কলম ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের পাশাপাশি ১টি বুক সেলফ, ১টি ছাতা এবং পড়ার টেবিল কিনেছে।

উপবৃত্তির টাকায় একটি নতুন স্কুল ব্যাগ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার শখ ছিল তাহমিনার। কিন্তু উপবৃত্তির টাকা পর্যাপ্ত নয় বলে কিনতে পারেনি। পড়াশুনায় ভালো করার লক্ষ্যে স্কুলের বাইরে প্রাইভেট পড়ে সে। তার শিক্ষাবাবদ প্রতিমাসে ব্যয় ৪০০/৫০০ টাকা। উপবৃত্তি পায় মাত্র ১০০ টাকা। বাবা মায়ের পক্ষে বাকি টাকার যোগান দেয়া কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। উপবৃত্তির টাকা আরো একটু বেশী হলে সে তার স্বপ্নযাত্রায় আরো সহজে অগ্রসর হতে পারতো।

১.৮.খ. মিড-ডে মিল

শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ হিসেবে অনেকেই দারিদ্র্যকে দায়ী করেছেন। দারিদ্র্যকে বিবেচনা এবং সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকার শিক্ষার্থীদের জন্য মিড-ডে মিল বা টিফিনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তবে এই কার্যক্রমের সুবিধা এখনো সব পর্যায়ে দেখা যাচ্ছেনা বলে সুপ্র পরিচালিত নিরীক্ষায় উঠে এসেছে।

১৩১ জন সেবা গ্রহীতার মধ্যে ৩৮.২ শতাংশ বলেছেন, বিদ্যালয়ে টিফিন দেয়া হচ্ছে, বাকি ৬১.৬৮ শতাংশ ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তাদের মতে, বিদ্যালয়ে কোন টিফিন দেয়া হচ্ছে না। তবে টিফিন দেয়া হচ্ছে এমন উত্তরদাতার ৮৯.৩ শতাংশই মনে করেন টিফিনের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়।

বিদ্যালয়ে টিফিনের ফলে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে থাকতে উৎসাহিত হচ্ছে বলে মনে করেন ৪৫.৫ শতাংশ এবং উৎসাহিত হচ্ছেনা বলে মনে করেন ৫৪.৫ শতাংশ উত্তরদাতা। তবে বিদ্যালয়ে টিফিন দেয়ার দরকার আছে বলে মনে করেন ১৯৭ জনের মধ্যে ৮০.১ শতাংশ। এক্ষেত্রে ৭৭ শতাংশ ভালো টিফিন হিসেবে কলা, ১৪.৫ শতাংশ রুটি, ৮.৪ শতাংশ ডিম, ৪.৮৩ শতাংশ খিচুড়ি এবং ৩.৮২ শতাংশ সিংগাড়ার পক্ষে মত দেন। তবে বর্তমানে প্রদানকৃত টিফিনের মান নিয়ে ১০৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে খুব সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ১.৯ শতাংশ, সন্তুষ্ট বলেছেন ৩২ শতাংশ, অল্প সন্তুষ্ট বলেছেন ৬৪.২ শতাংশ এবং অসন্তুষ্ট বলেছেন ১.৯ শতাংশ।

বর্তমানে প্রদানকৃত টিফিনের মান নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি			
খুব সন্তুষ্ট	সন্তুষ্ট	অল্প সন্তুষ্ট	অসন্তুষ্ট
১.৯%	৩২%	৬৪.২%	১.৯%

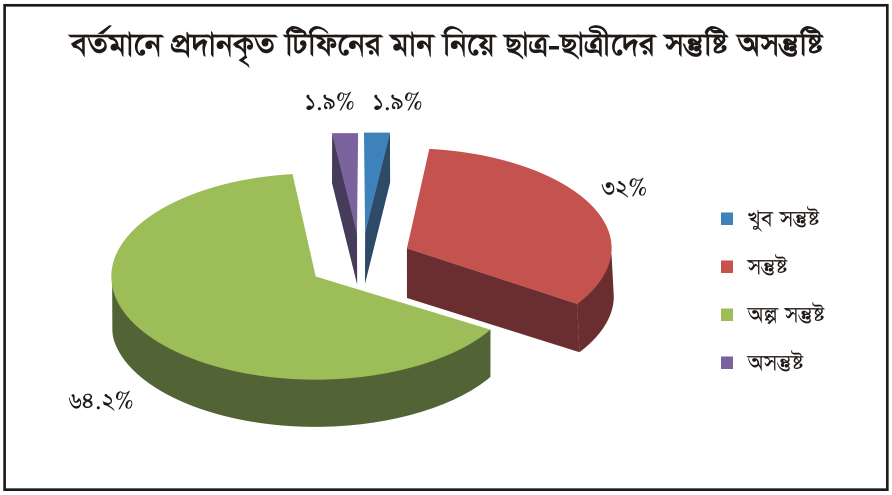
বর্তমানে প্রদানকৃত টিফিনের মান নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি

১.৮.গ. ফিডিং প্রকল্প

দারিদ্রপীড়িত এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে টেকসই এবং গতিশীল রাখতে সরকারের পক্ষ থেকে ফিডিং প্রকল্প চালু করা হয়েছে। সুপ্র পরিচালিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, অনেকেই এটিকে কার্যকর বলে মনে করছেন না। সমীক্ষায় অংশ নেয়া সেবা প্রদানকারী ১১৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫৪.৫৬ শতাংশ মনে করছেন এটি একটি কার্যকর পদক্ষেপ, বাকি ৪৫.৪ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করছেন এটি কোন কার্যকর পদক্ষেপ নয়।

ফিডিং প্রকল্প বিষয়ে সেবাদাতাদের অভিমত	
কার্যকর পদক্ষেপ বলে মনে করেন	কার্যকর পদক্ষেপ নয় বলে মনে করেন
৫৪.৬%	৪৫.৪%

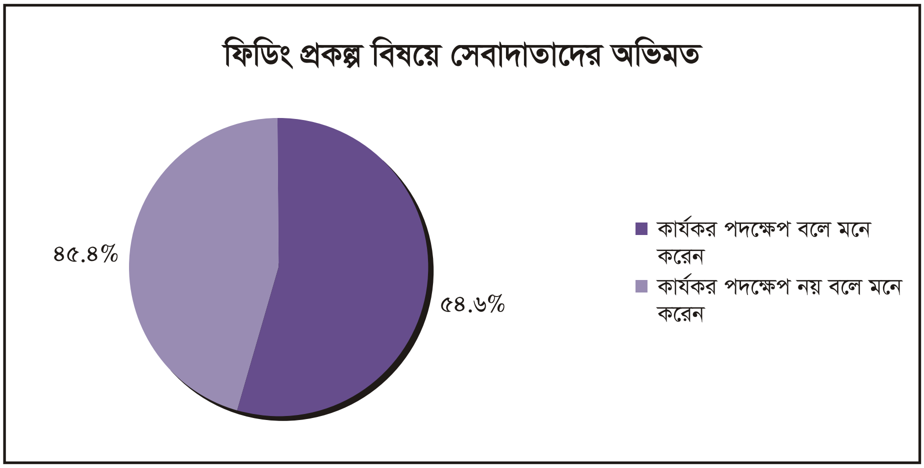

১.৯ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা

দাতা, শিক্ষানুরাগী, অভিভাবক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ইউপি সদস্য, শিক্ষক প্রতিনিধি ও নারী অভিভাবকসহ ১১ সদস্য বিশিষ্ট স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এসএমসি) বিদ্যালয় পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি মাসে একবার করে বছরে ১২টি সভা হওয়ার কথা রয়েছে। প্রতিটি মিটিং-এর কার্যবিবরণী লেখার বিধান থাকলেও এসএমসি'র সকল সদস্য এই বিষয়ে সঠিকভাবে অবগত নয় বলে নিরীক্ষায় দেখা গেছে। প্রতি মাসে ১টি করে সভা হয় বলে জানিয়েছেন ৮৮.২ শতাংশ সদস্য। ৬.৩ শতাংশ সদস্য বলেন ২ মাস পরপর এবং ৫.২ শতাংশ সদস্য তিন মাসে একবার এসএমসি'র সভা হওয়ার কথা।

কমিটির সভা নিয়মিত হয় কিনা এই বিষয়ে ১৪৩ জন উত্তরদাতার ৫১ শতাংশ পক্ষে এবং ৪৯ শতাংশ হয়না বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

এসএমসির সভা নিয়মিত হয় কি না এ প্রসঙ্গে সেবাদাতাদের অভিমত	
সভা নিয়মিত হয় বলে অভিমত দেন	সভা নিয়মিত হয় না বলে অভিমত দেন
৫১%	৪৯%

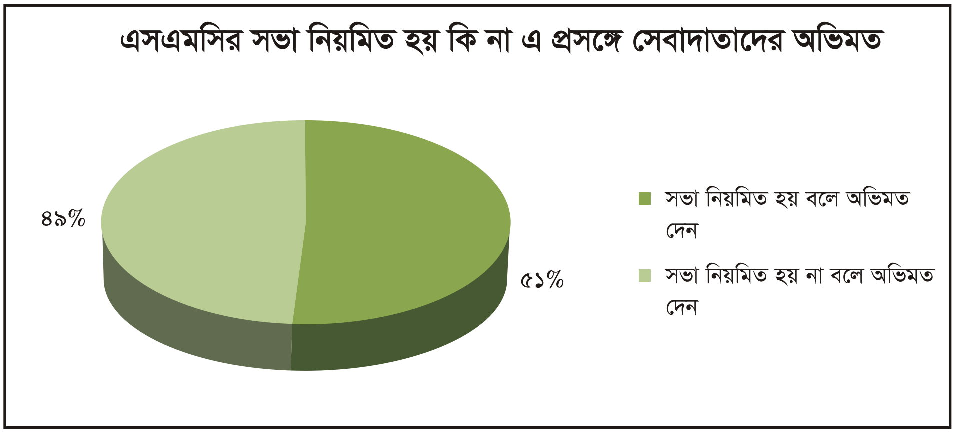

অনেক ক্ষেত্রে কমিটির সদস্য বিদ্যালয়ের ক্রয় কমিটিসহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখলেও অনেক জায়গাতে তারা মূল পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমের বাইরে থাকছে। উত্তরদাতা ১৪১ জন সদস্যের মধ্যে ৫২.৪৮ শতাংশ সদস্য বলেন তারা ক্রয় কমিটিতে ভূমিকা রাখছেন, বাকি ৪৭.৫২ শতাংশ উল্লেখ করেন, তারা ক্রয় কমিটিতে নেই। যারা ক্রয় কমিটিতে ভূমিকা রাখছেন তাদের ৭৬.৮ শতাংশ বলেন তারা শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের সাথে জড়িত, অবকাঠামো উন্নয়নে সম্পৃক্ত এমন উত্তর দিয়েছেন ৬৬.৭ শতাংশ এবং অন্যান্য উপকরণ ক্রয়ে সম্পৃক্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন ৩৫.৩ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়া সদস্যরা বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান, নানা আয়োজন, উপবৃত্তি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বলে সংশ্লিষ্টরা মত প্রকাশ করেন।

১.১০ সরকারি মনিটরিং ব্যবস্থা

সরকারি মনিটরিং এর ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সঠিক উপস্থিতি, নিয়মিত পাঠদান এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কার্যক্রম নিয়ম অনুযায়ী পরিচালনা করা সম্ভব। সরকারি নিয়মানুযায়ী প্রতিমাসে নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করার কথা রয়েছে। তবে জেলা ও উপজেলা পর্যায় থেকে বিদ্যালয়ে নিয়মিত পরিদর্শন করা হয় কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ৯৫.৪ শতাংশ উত্তরদাতা হ্যাঁ সূচক জবাব প্রদান করেন, বাকি ৪.৬ শতাংশ মনে করেন যে, নিয়মিত পরিদরর্শন করা হয়না। প্রতি মাসে কয়টি পরিদর্শন হয় এমন প্রশ্নের জবাবে ৬৮.৭ শতাংশ বলেছেন মাসে ১ বার, ২৯.৪ শতাংশ বলেছেন মাসে ২ বার এবং ০.৮ শতাংশ বলেছেন মাসে ৪ বার পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয় তদারকির জন্য যথেষ্ঠ জনবল আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ৪১.৮ শতাংশ বলেছেন আছে, বাকি ৫৮.২ শতাংশ নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বিদ্যালয় তদারকির জন্য জনবল যথেষ্ট কি না এ প্রসঙ্গে সেবাদাতাদের অভিমত	
জনবল যথেষ্ট বলে মনে করেন	জনবল যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন
৪১.৮%	৫৮.২%

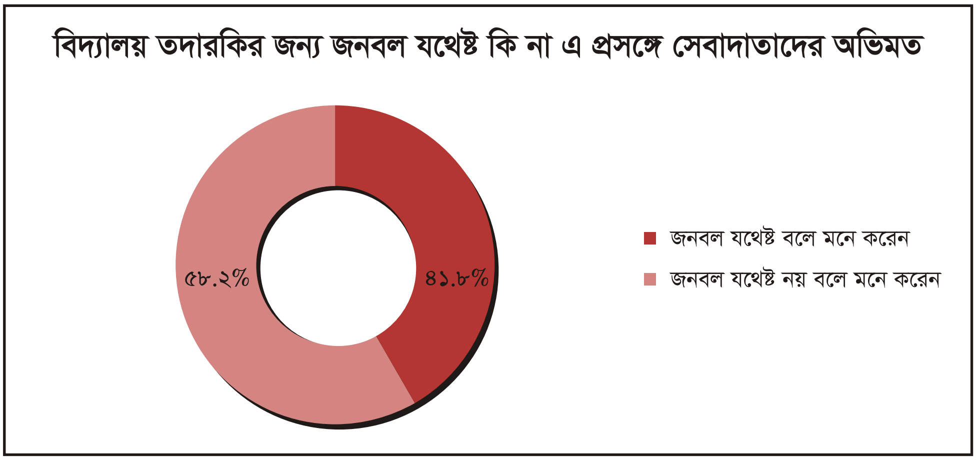

কেইস স্টোরি-৩

মেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন

কৌশলী চাকমা জন্মসূত্রে রাঙ্গামাটি জেলা শহরের একজন স্থায়ী বাসিন্দা। তার বাবা তেজেন্দ্র চাকমা কৃষি কাজ এবং মৎস শিকার করে পরিবারের সদস্যদের ভরণ পোষণ করেন। কৌশলী চাকমার বয়স ১৪। তিন ভাই-বোনের মধ্যে সে দ্বিতীয়।

কৌশলী চাকমা ১২ বছর বয়সে যখন ৫ম শ্রেণীতে পড়ে সে সময় ৫ম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষা সমাপ্ত করতে পারেনি। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়া তার বোন বৈশাখী চাকমাসহ স্কুল ত্যাগ করে। বর্তমানে মায়ের কাজে সহায়তা করে এবং ঘরের বাইরে কাজের সন্ধান করছে। মেয়েদের শিক্ষা জীবন ব্যাহত হওয়ায় বাবা মা মনক্ষুন্ন। দারিদ্রতার কারণে, বাসায় গৃহ শিক্ষক না নিয়োগ দিতে পারার কারণে মেয়েদের শিক্ষা জীবনের অবসান ঘটায় কৌশলী চাকমার বাব মার আক্ষেপ যেন ফুরায় না। স্কুলের পোষাক এবং খেলাধুলার উপকরণ মেয়েদেরকে কিনে দিতে পারেনি বাবা-মা। মেয়েদের সাথে কথা বলে জানা যায়, মেয়েদেরকে তাদের বাবা মা সময়মত শিক্ষা উপকরণ কিনে দিতে পারেনি। ক্লাসরুমে শিক্ষকদের পাঠ্যবইয়ের পড়া সহজে বুঝতে পারতো না। বাড়ীতে গৃহ শিক্ষক রাখারও সামর্থ্য ছিল না বাবা মায়ের। বাবা মায়ের আক্ষেপ, স্কুলে পড়াশুনা নিয়মতান্ত্রিক হলে গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাই অনুভূত হত না। স্কুল টিফিনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের আরো যত্নবান হওয়া প্রয়োজন মনে মনে বাবা মায়ের কাছে। উপবৃত্তির আওতা এবং পরিমান আরো বৃদ্ধি প্রয়োজন- এটা সবসময়ই মনে হয়।

সুপারিশ

জেলা পর্যায়ে আয়োজিত সেমিনারের মাধ্যমে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রী, ব্যবস্থাপনা কমিটি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য যে সব সুপারিশ পাওয়া গেছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

- প্রত্যেকটি গ্রামে কমপক্ষে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা;
- চরাঞ্চলের শিশুদের জন্য দুপুরের খাবার, উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ নতুন করে বিদ্যালয় নির্মাণ করা;
- শিক্ষার্থীরা যাতে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পাঠ্য বই পায় সেজন্য ডিসেম্বর মাসেই সকল বিষয়ে নতুন বই পাঠানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। দূরত্ব অনুযায়ী উপজেলা থেকে বিদ্যালয় পর্যন্ত বই পরিবহনের ন্যায্য খরচ বইয়ের সাথে সাথে প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- বই বিতরণ ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার জন্য শিক্ষক ও এসএমসি'র মনিটরিং জোরদার করা;
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১ঃ৩০ করা এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া;
- সকল শিক্ষকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- প্রতিবন্ধী শিশুদের মূল স্রোতধারার শিক্ষায় নিয়ে আসার জন্য প্রত্যেকটি স্কুলের সকল শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষার ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটির ভূমিকা আরও সক্রিয় করতে হবে;
- এসএমসি সক্রিয় করার জন্য গঠন প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা;
- পর্যাপ্ত ক্লাসরুম ও অবকাঠামো নির্মাণ করা। স্কুলের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করা ও পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা;
- নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষকদের বদলি করা। বদলির ক্ষেত্রে নারী শিক্ষকদের সুবিধার কথা বিবেচনায় রাখা;
- অফিস সহকারী বা করণীক, পরিচ্ছন্ন কর্মী ও নৈশপ্রহরীর পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ দেওয়া;
- শিক্ষা ছাড়া শিক্ষকদের অন্য কাজে সম্পৃক্ত না করা এবং সময়মতো বেতন-ভাতা ও বিল প্রদান করা;
- শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে মানসম্মত বেতন স্কেল প্রদান করা;
- দরিদ্রপ্রবণ এলাকায় মিড-ডে স্কুল মিল চালু করাসহ সকল বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা;
- বিদ্যালয়ে নিয়মিত খেলাধুলাসহ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং অন্য বিদ্যালয়ের সাথে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা;
- বিদ্যালয়কে শিশুবান্ধব করা এবং বিদ্যালয়ে আনন্দময় পরিবেশ তৈরি ও পর্যাপ্ত বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা;
- বিদ্যালয়ে শিশুদেরকে বিনা মূল্যে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা ও ঔষধ প্রদান করা;
- গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে খাতা, কলম ও যাবতীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা;
- পর্যাপ্ত খেলার উপকরণ সরবরাহসহ ক্রীড়া শিক্ষক নিয়োগ করা;
- প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা।

তৃতীয় অধ্যায় ৩

পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন:
স্বাস্থ্যসেবা চিত্র

পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন: স্বাস্থ্যসেবা চিত্র

২.১ অংশগ্রহণকারীর ধরণ

২০টি জেলায় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতির উপর নিরীক্ষা কার্যক্রম চালানো হয়। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতির উপর পরিচালিত নিরীক্ষায় ৯৮৬ জন সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মাঝে সদর হাসপাতাল থেকে ৩৩.৪০ শতাংশ, কমিউনিটি হাসপাতাল থেকে ১২.৯ শতাংশ এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ১৩.৫ শতাংশ উত্তরদাতার কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। স্বাস্থ্য সেবাদাতাদের মধ্যে ৪০.২ শতাংশ জেলা সদর হাসপাতালের, ২৪.৭ শতাংশ উপজেলা হাসপাতালের, ২৭.৯ শতাংশ ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এবং ৭.২ শতাংশ কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিকের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সাথে যুক্ত।

২.২ জনবল

যেখানে স্বাস্থ্য পরিসেবার জন্য পর্যাপ্ত ও দক্ষ জনবল অত্যাবশ্যকীয় শর্ত সেখানে দেশে ৪৭১৯ জনের জন্য ১ জন ডাক্তার এবং ৮২২৬ জনের জন্য ১ জন করে নার্স রয়েছে। গত ৩ বছরে সরকার এডহক ভিত্তিতে ৪ হাজার ১৩৩ জন এবং বিসিএস এর মাধ্যমে প্রায় ১ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছে। দেশের প্রায় ১৬ কোটি মানুষের সেবা নিশ্চিতকরণে যা খুবই অপ্রতুল।

সরকারি চিকিৎসা সেবাখাতে জনবল সংকট রয়েছে খুব বেশী পরিমানে। এই সংকট চরমভাবে রয়েছে উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে। যে সীমিত জনবল রয়েছে সেখানেও রয়েছে সমস্যা। যারা নিয়োগ পান তাদের অনেকেই ছুটিতে থাকেন কিংবা প্রেষণে অন্য কোথাও কাজ করেন। যে অল্প সংখ্যক চিকিৎসক এবং নার্স আছেন তাদের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও মানসম্মত চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। হাসপাতালের আউটডোরের রোগীরা সবচাইতে বেশী অসুবিধার মধ্যে পড়েন। ডাক্তার, নার্সের তুলনায় রোগীর সংখ্যা এত বেশী যে চিকিৎসা দূরে থাক রোগীদের কথা পর্যন্ত শোনার অবকাশ পান না চিকিৎসাকর্মীগণ। দিন দিন খাবারে ভেজাল বাড়ছে, পরিবেশ দূষিত হচ্ছে ফলে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে ব্যাপকহারে। সেই হারে চিকিৎসাকর্মীর সংখ্যা বাড়ছে না।

দুঃখজনক ব্যাপার হলো চিকিৎসাকর্মীগণ গ্রামমুখী হতে চান না। গ্রামাঞ্চলে ডাক্তাররা থাকতে চান না এ সমস্যাটা অনেকদিনের। সরকার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে ডাক্তারগণ যাতে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকে তৃণমূলে থেকে চিকিৎসা সেবা দেয় কিন্তু ডাক্তারগণ সেখানে সহায়ক পরিবেশ না পাওয়ার কারণে থাকতে চান না। ফলস্বরূপ, আমাদের গ্রামের মানুষ প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা পায় না।

হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের জন্য যে জনবল বা ডাক্তার আছে তা যথেষ্ট কি না জানতে চাওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য সেবাদাতাদের কাছে। তাদের ৮৪.৩ শতাংশই বলেছেন সংখ্যাটা যথেষ্ট নয়। ১৫.৭ শতাংশ স্বাস্থ্যপ্রণেতা বর্তমান জনবল নিয়ে সন্তুষ্ট।

হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের জন্য যে জনবল বা ডাক্তার আছেন তা যথেষ্ট কি না তা জানতে চাওয়া হয় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারীদের কাছে। বর্তমান জনবল যথেষ্ট নয় বলে মতামত দেন ৮৪.৪ শতাংশ উত্তরদাতা এবং ১৫.৬ শতাংশ মনে করেন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের জন্য যে জনবল/ডাক্তার আছে তা যথেষ্ট। পরিতাপের বিষয়, জনগণের টাকায় এসব হাসপাতালের খরচ নির্বাহ করা হয় অথচ দরিদ্র জনগণ কাঙ্ক্ষিত সেবা পায় না। রোগীর তুলনায় ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য সেবাকর্মীর অপ্রতুলতায় রোগীরা যথাযথ সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

হাসপাতালের জনবল নিয়ে সেবাদাতা এবং সেবাগ্রহীতার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি			
সেবাদাতাদের অভিমত		সেবাগ্রহীতাদের অভিমত	
জনবল নিয়ে সন্তুষ্ট	সন্তুষ্ট নয়	জনবল নিয়ে সন্তুষ্ট	সন্তুষ্ট নয়
১৫.৭%	৮৪.৩%	১৫.৬%	৮৪.৪%

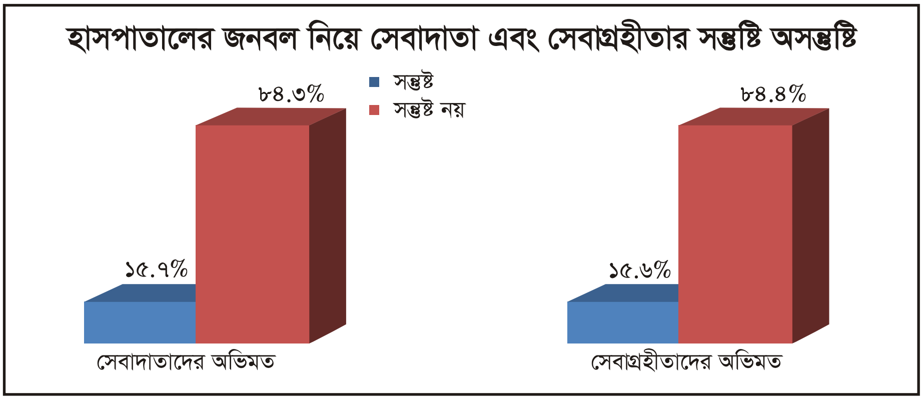

সেবাদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় প্রয়োজনীয় ডাক্তার না থাকার কারণ সম্পর্কে। প্রয়োজনীয় ডাক্তার না থাকার কারণ হিসেবে ৫৪.৪ শতাংশ বলেছেন বাজেট স্বল্পতার কথা। ৩৫.৪ শতাংশ বলেছেন, প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে ডাক্তারদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অনীহার কথা। ১.৯ শতাংশ বলেছেন ডাক্তাররা প্রাইভেট ক্লিনিকে ব্যস্ত থাকে এবং ৮.২ শতাংশ বলেছেন ডাক্তার প্রাইভেট প্র্যাকটিসে ব্যস্ত থাকেন বলে হাসপাতালে নিয়মিত রোগী দেখেন না।

প্রয়োজনীয় ডাক্তার না থাকার কারণ সম্পর্কে সেবাদাতাদের অভিমত			
বাজেট স্বল্পতা	প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে সেবা দিতে ডাক্তারদের অনীহা	প্রাইভেট ক্লিনিকে ডাক্তারদের ব্যস্ত থাকা	ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে ব্যস্ত
৫৪.৪%	৩৫.৪%	১.৯%	৮.২%

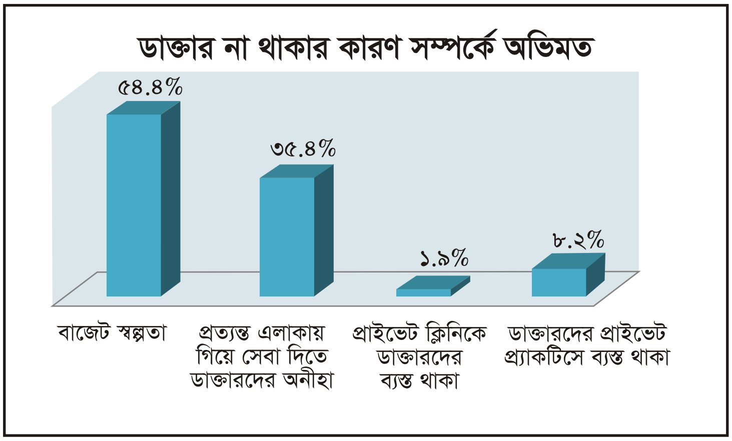

রোগীদের কাছে ডাক্তারের চিকিৎসা ফলপ্রসূ করার জন্য হাসপাতাল গুলোতে পর্যাপ্ত সেবাকর্মী প্রয়োজন। ৭৭.১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন হাসপাতাল গুলোতে ডাক্তার ব্যতিরেকে পর্যাপ্ত সেবাকর্মী নেই এবং ২২.৯ শতাংশ মনে করেন বর্তমানে যে সংখ্যক সেবাকর্মী আছে তা যথেষ্ট।

সেবাদাতাদের ৬০.২ শতাংশ মনে করেন, মা ও শিশুর জন্য যে ধরণের সেবা প্রদান করা হচ্ছে তা স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত এবং ৩৯.৮ শতাংশ মনে করেন এ সেবা অপর্যাপ্ত। পর্যাপ্ত সেবা না থাকার কারণ হিসেবে ৫০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন অপ্রতুল বাজেটের কথা। ৩৫ শতাংশ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভাবকে চিহ্নিত করেছেন, ৯.৫ শতাংশ প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবের কথা বলেন এবং ৪.৪ শতাংশ প্রয়োজনীয় সেবা কর্মীর অভাবের কথা উল্লেখ করেন।

মা ও শিশু প্রয়োজনীয় সেবা না পাওয়ার কারণ প্রসঙ্গে সেবাদাতাদের অভিমত

অপ্রতুল বাজেট	বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভাব	প্রয়োজনীয় উপকরণ না থাকা	প্রয়োজনীয় সেবাকর্মী না থাকা
৫০%	৩৫%	৯.৫%	৪.৪%

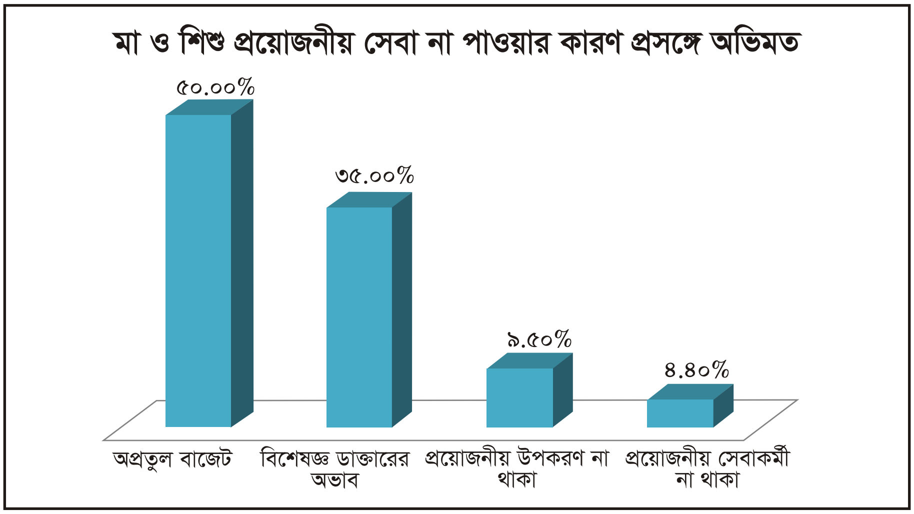

কেইস স্টোরি-১

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স: ৯ জনের জায়গায় আছেন মাত্র ২ জন চিকিৎসক

(২৫ আগস্ট ২০১১, দৈনিক প্রথম আলো)

৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে ৯ জনের জায়গায় মাত্র ২ জন চিকিৎসক রয়েছেন। এ্যাম্বুলেন্স ও এক্সরে মেশিন বিকলসহ রয়েছে চিকিৎসা উপকরণের অভাব। এই কমপ্লেক্সে দীর্ঘদিন ধরে আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও), কনিষ্ট পরামর্শক (অবেদনবিদ), কনিষ্ট পরামর্শক (গাইনী), কনিষ্ট পরার্শক (মেডিসিন), সহকারী সার্জন (ডেন্টাল) ও একজন চিকিৎসা কর্মকর্তার পদ শূন্য রয়েছে। চিকিৎসক স্বল্পতার সুযোগে চিকিৎসা সহকারীরাই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দাপট দেখিয়ে থাকে। একটি এম্বুলেন্স জোড়াতালি দিয়ে চললেও ৬ মাস ধরে বিকল রয়েছে। রোগীদের অনেক সময় ঔষধ বা খাবার দেওয়া হয় না। এক রোগীকে সিজার করে ১৬০০ টাকা নেয়া হয়েছে। সেইসাথে বেশীরভাগ ঔষধ বাইরে থেকে কিনতে হয়েছে।

২.৩ আবাসন ব্যবস্থা

নিরীক্ষার আওতাধীন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র থেকে শুরু করে জেলা সদর হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ডাক্তারদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা থাকলেও সেগুলোর অবস্থা খুব একটা সুবিধাজনক নয়। জেলা সদর হাসপাতালে নার্সদের জন্য আবাসন সুবিধা আছে তবে সেগুলো মানসম্মত নয় বলে অধিকাংশ নার্সের অভিমত। বর্তমানে যে আবাসন ব্যবস্থা আছে তা বসবাসের উপযুক্ত নয় বলে উল্লেখ করেন ৩৯.৫ শতাংশ এবং ৬০.৫ শতাংশ আবাসন ব্যবস্থা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আবাসন ব্যবস্থা নিয়ে সেবাদাতাদের অভিমত	
আবাসন ব্যবস্থা বাসোপযোগী বলে মনে করেন	আবাসন ব্যবস্থা বাসোপযোগী নয় বলে মনে করেন
৬০.৫%	৩৯.৫%

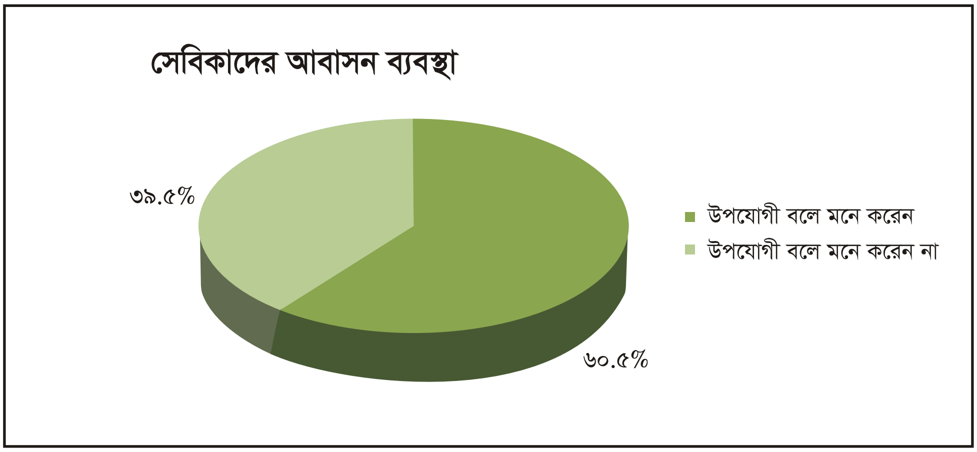

তৃণমূল মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সহজলভ্য এবং অল্প খরচের মাধ্যম হলো ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক। ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোত আবাসন ব্যবস্থা থাকলেও সেগুলো বসবাসের উপযোগী নয় বলে অধিকাংশ মত দেন। অধিকাংশ রুমগুলোতেই তালা ঝুলছে। এ স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলোতে পর্যাপ্ত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে একদিকে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা গ্রামমুখী হবে। অন্যদিকে তৃণমূল মানুষ তাদের কাঙ্খিত স্বাস্থ্যসেবা পাবে।

কেইস স্টোরি-২

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সেবা

দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার ইন্দ্রপুর গ্রামের ৩২ বছর বয়সী মোছাঃ ছামিয়ারা খাতুন একজন গৃহিনী। আর্থিক অবস্থা করুণ। ৪ ছেলে নিয়ে তার সংসার। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভালো না থাকায় অসুস্থতার কারণে ভালো কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সামর্থ্য না থাকায় সে স্থানীয় ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে যায়।

সেখানে এসে দেখে যে, রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মত কোন যন্ত্রপাতি নেই এমনকি দক্ষ ডাক্তার ও জনবল নেই। ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যে দূর্বল চিকিৎসা সেবা সে চিকিৎসায় তার ভালো হওয়ার সুযোগ নেই বলে মনে করেন তিনি।

২.৪ প্রশিক্ষণ

দেশের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় নিয়োজিত সরকারি/বেসরকারি সকল স্তরের চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিকস ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত পেশাগত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, কোর্স ও ধারাবাহিক মেডিকেল এডুকেশন প্রদানের কথা জাতীয় খসড়া স্বাস্থ্যনীতিতে উল্লেখ করা হলেও বাস্তব পরিস্থিতে দেখা যায় নার্সদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের তেমন সুযোগ নেই। অথচ গুণগত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা খুবই জরুরি। ল্যাব টেকনিশিয়ানদের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ব্যবহার করতে হয়। এক্ষত্রে তাদের আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ না থাকলে তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারবে না।

কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য হাসপাতাল থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি	
প্রশিক্ষণ পেয়েছেন	প্রশিক্ষণ পাননি
৭৪.৬%	২৫ .৪%

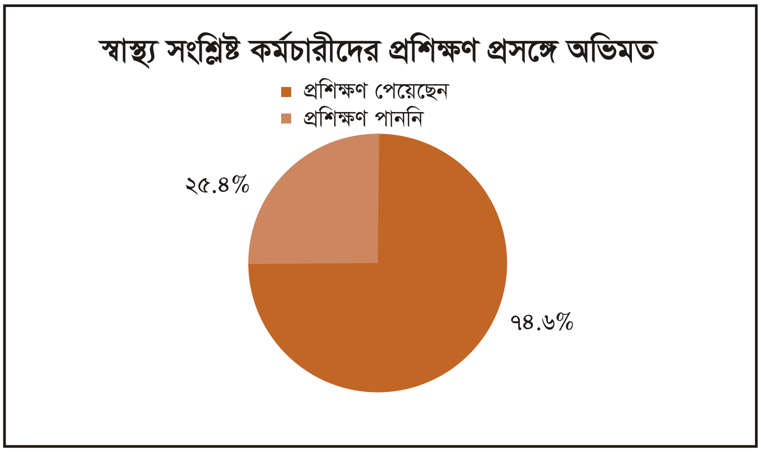

নিরীক্ষাভুক্ত হাসপাতালের সেবা দতাদের ৬৭.৮ শতাংশ বলেছেন, কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য হাসপাতাল থেকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে এবং ৩২.২ শতাংশ বলেছেন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে বলে যারা উত্তর দিয়েছেন তাদের মধ্যে ৭৪.৬ শতাংশ বলেছেন তারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং ২৫.৪ শতাংশ বলেছেন প্রশিক্ষণ পাননি।

২.৫ অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় উপকরণ

যারা স্বাস্থ্যসেবাদাতা তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্পর্কে। ৩১.৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের জন্য যে অবকাঠামো ও আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকা দরকার হাসপাতালগুলোতে তা আছে। কিন্তু ৬৮.৩ শতাংশ এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। যারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তাদের মধ্যে ৫৭.৭ শতাংশ বাজেট স্বল্পতাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ২২.৩ শতাংশ বলেছেন আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কথা। ২০ শতাংশ বলেছেন কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের কথা।

প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও আধুনিক যন্ত্রপাতি না থাকার কারণ প্রসঙ্গে সেবাদাতাগণের অভিমত		
বাজেট স্বল্পতা	আমলাতান্ত্রিক জটিলতা	কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ
৫৮%	২২%	২০%

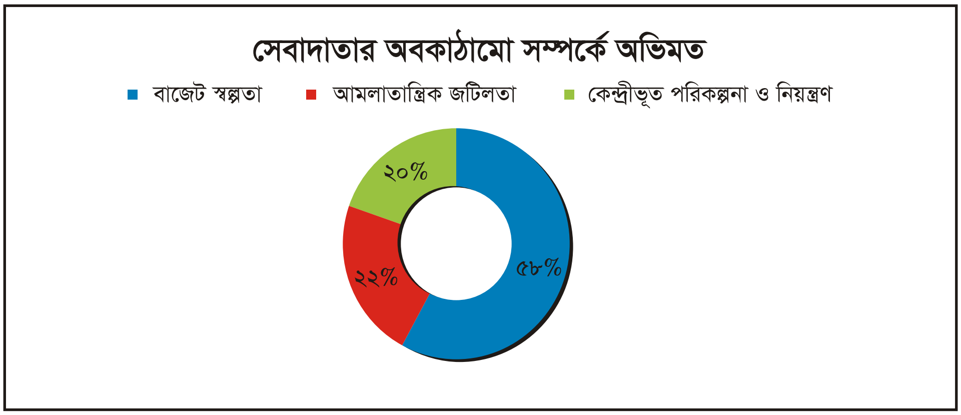

হাসপাতালের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হয় বলে ৫৭.৬ শতাংশ অভিমত দেন এবং ৪২.৪ শতাংশ বলেন, বিনামূল্যে সেবা দেয়া হয় না। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২২.৩ শতাংশ মনে করেন হাসপাতালের উপকরণ এবং সরঞ্জামাদি সেবা গ্রহণকারী অনুপাতে পর্যাপ্ত নয় এবং ৭৭.৭ শতাংশ মনে করেন পর্যাপ্ত। পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদি চাহিদা জানানো হলেও অনেক সময় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয় না এবং এর কারণ হিসেবে উত্তরদাতার ৪৫.৯% বাজেট স্বল্পতার কথা বলেন। বাকি উত্তরদাতা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং গুরুত্বের অভাবকে দায়ী করেন।

উপকরণ ও সেবা সরঞ্জামাদি সেবা গ্রহণকারী অনুপাতে পর্যাপ্ত কি না এ প্রসঙ্গে সেবাদাতাদের অভিমত	
পর্যাপ্ত বলে মনে করেন	অপর্যাপ্ত বলে মনে করেন
২২.৩%	৭৭.৭%

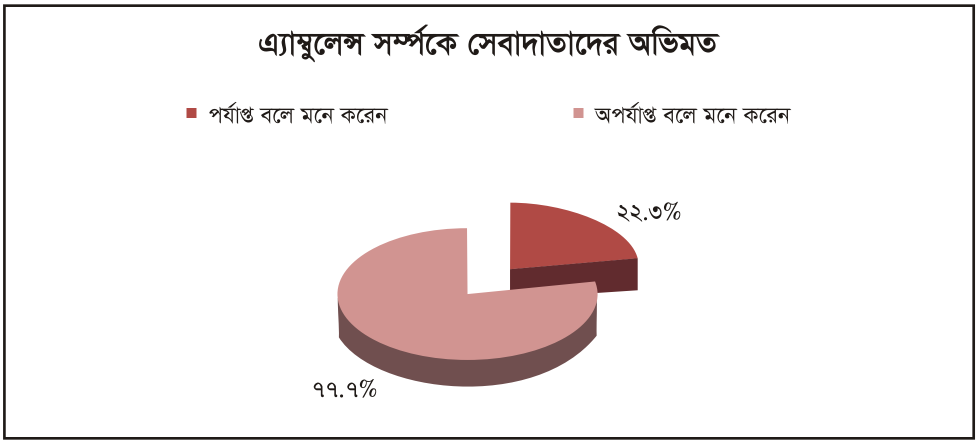

হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এ্যাম্বুলেন্স আছে কি না এর উত্তরে হ্যাঁ সূচক উত্তর দেন ৭১.৫ শতাংশ এবং ১৮.৬ শতাংশ না সূচক উত্তর দেন। যে এ্যাম্বুলেন্স আছে সেগুলোর মধ্যে সচল আছে বলে জানান ৭৪.৯ শতাংশ উত্তরদাতা। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৮.৮ শতাংশ বলেন, সেবা গ্রহণকারীরা ভাড়ার তালিকা অনুযায়ী এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করে।

হাসপাতালে বিকল্প বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে কি না এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ৫৪.৪ শতাংশ হ্যাঁ সূচক উত্তর দেন কিন্তু ৪৪.২ শতাংশ না বলেন। যে সকল জায়গায় বিকল্প ব্যবস্থা আছে সেখানে জেনারেটর আছে বলেছেন ৬৫.৭ শতাংশ, আইপিএস আছে বলেছেন ৫ শতাংশ এবং ২৯.৩ শতাংশের এ বিষয়ে ধারণা নেই বলে উল্লেখ করেন।

হাসপাতালে বিকল্প বিদ্যুতের ব্যবস্থা প্রসঙ্গে সেবাদাতাদের অভিমত		
জেনারেটর	আইপিএস	কোনো ধারণা নেই
৬৫.৭%	৫.০%	২৯.৩%

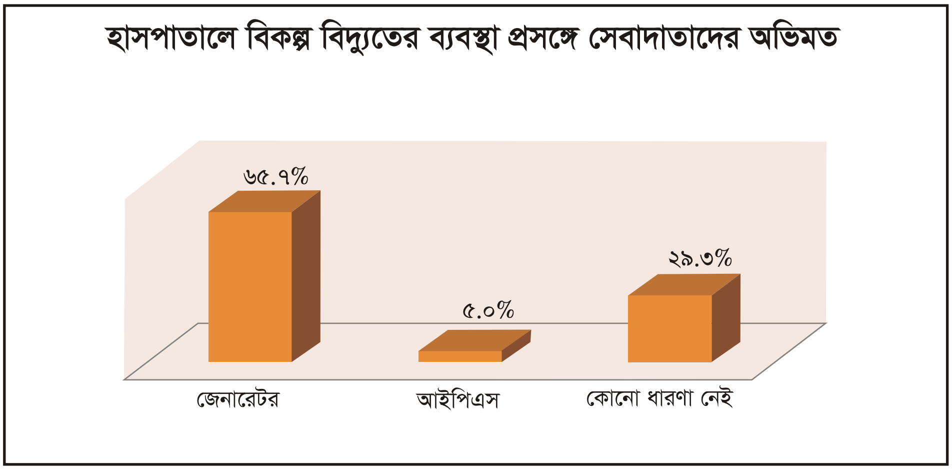

বিদ্যুৎ সংকটের মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে দেশ। বিদ্যুতের উল্লেখযোগ্য বিকল্প এই ব্যবস্থাগুলো সচল কি না তা জানতে চাওয়া হয়েছিল সেবাদাতাদের কাছে। এ প্রসঙ্গে ৫৩.৪ শতাংশ বলেছেন বিকল্প ব্যবস্থাগুলো সচল আছে। ৩২.১ শতাংশ বলেছেন সচল নেই এবং ১৪.৫ শতাংশ বলেছেন এ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই।

বিকল্প বিদ্যুতের ব্যবস্থাগুলো সচল কি না এ প্রসঙ্গে সেবাদাতাগণ		
সচল আছে	সচল নেই	কোনো ধারণা নেই
৫৩.৪%	৩২.১%	১৪.৫%

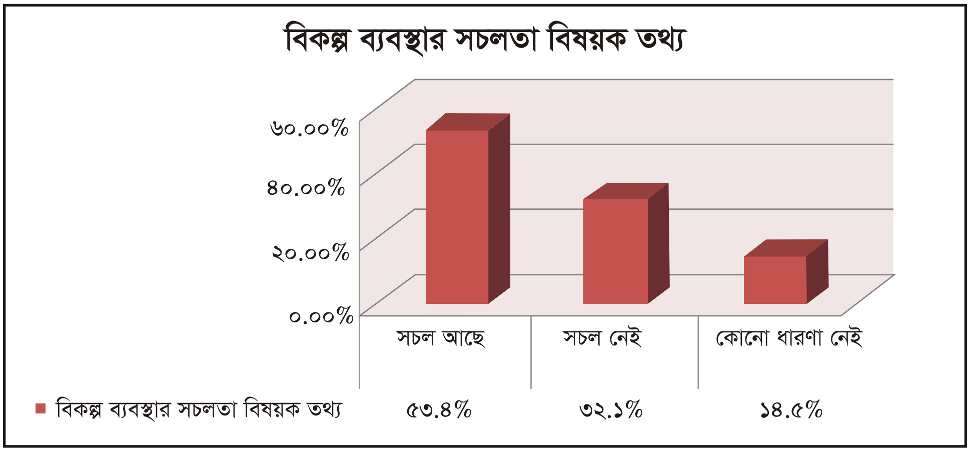

৮৮ শতাংশ সেবাদাতা বলেন হাসপাতালে ঔষধের তালিকা আছে এবং ১২ শতাংশ ঔষধের তালিকা নেই বলে উল্লেখ করেন। যে সকল জায়গায় ঔষধের তালিকা আছে সেখানে ৭১.৫ শতাংশ বলেন, তালিকা নির্দিষ্ট জায়গায় টানানো আছে এবং ২৮.৫ শতাংশ বলেছেন ঔষধের তালিকা নির্দিষ্ট জায়গায় টানানো নেই।

হাসপাতালে তালিকাভুক্ত যে ঔষধ আসে সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কি না এ প্রশ্নের উত্তরে ১৯.৯ শতাংশ হ্যাঁ বললেও ৭৯.৬ শতাংশ না বলেন। হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ পাওয়া যায় না রোগীদের এই অভিযোগ প্রসঙ্গে ৫০.৪ শতাংশ সেবাদাতা বলেন এ অভিযোগ কিছুটা সত্য, ৩২.৯ শতাংশ বলেন এ অভিযোগ সত্য নয় কিন্তু ১৬.৭ শতাংশ এ অভিযোগকে পুরোপুরি সত্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ পাওয়া যায় না এ প্রসঙ্গে সেবাদাতাগণ		
অভিযোগ কিছুটা সত্য	অভিযোগ সত্য নয়	অভিযোগ পুরোপুরি সত্য
৫০.৪%	৩২.৯%	১৬.৭%

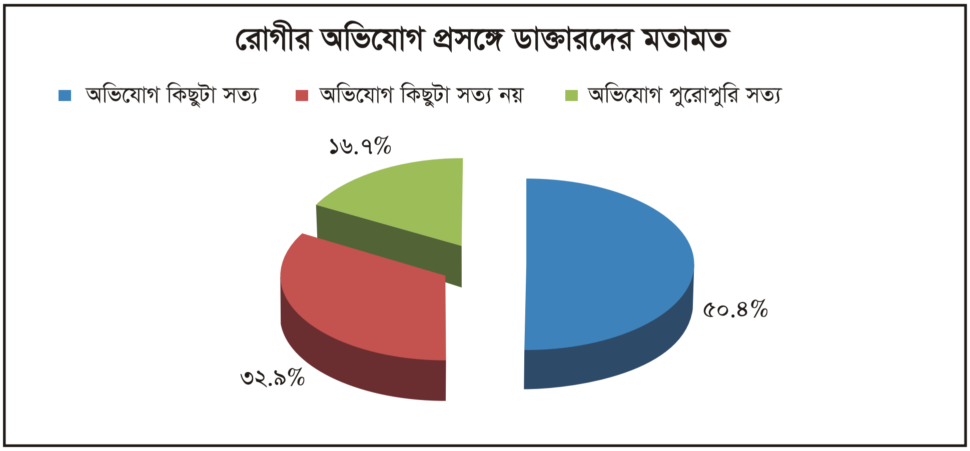

হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ না পাওয়ার কারণ হিসেবে ৮৫.৪ শতাংশ বলেন বরাদ্দ কম, ৯.৩ শতাংশ বলেন ঔষধের পুশ-ইন, ৪ শতাংশ ঔষধের অবৈধ ব্যবহারকে দায়ী করেন।

সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে ৪৯.৭ শতাংশ বলেছেন তারা ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক ঔষধ হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে পেয়েছেন এবং ৫০.৩ শতাংশ বলেছেন পাননি।

ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক ঔষধ হাসপাতাল থেকে পাওয়া যায় কি না এ প্রসঙ্গে সেবাগ্রহীতাদের অভিমত	
ঔষধ পাওয়া যায়	ঔষধ পাওয়া যায় না
৪৯.৭%	৫০.৩%

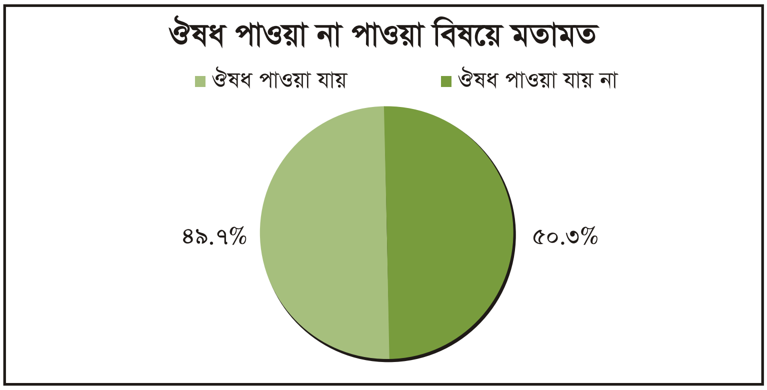

২.৬ সেবার মান ও ফিস্

সাধারণ মানুষ চায় সরকারি হাসপাতাল থেকে স্বল্প খরচে চিকিৎসা সেবা পেতে। চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে চিকিৎসার গুণগত মান একটি জরুরি বিষয়। চিকিৎসা সেবা নিয়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়। সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে ৫৭.৬ শতাংশ বলেন, প্রত্যাশা অনুযায়ী তারা হাসপাতাল থেকে সেবা পেয়েছেন এবং ৪২.৪ শতাংশ বলেছেন পর্যাপ্ত সেবা পাননি।

প্রত্যাশা অনুযায়ী হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা সেবা পেয়েছেন কি না এ প্রসঙ্গে সেবাগ্রহীতাদের অভিমত	
প্রত্যাশা অনুযায়ী চিকিৎসা সেবা পেয়েছেন	প্রত্যাশা অনুযায়ী চিকিৎসা সেবা পান না
৫৮%	৪২%

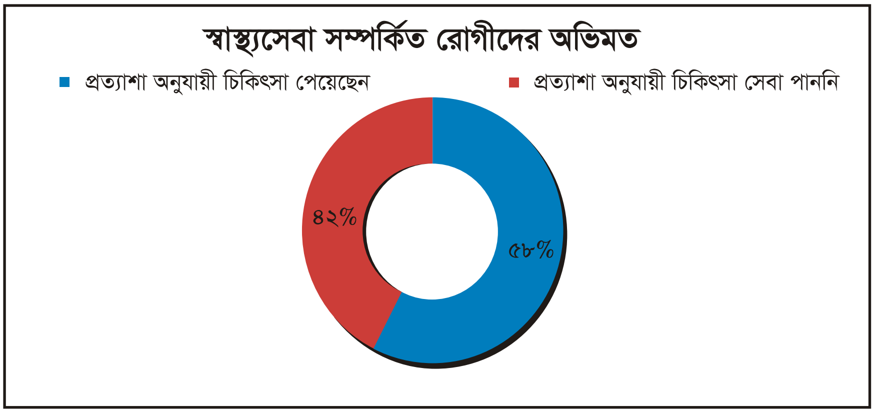

ডাক্তারদের ব্যবহারে ৬১.৫ শতাংশ এবং স্বাস্থ্যকর্মীর ব্যবহারে ৫৮.৭ শতাংশ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। ডাক্তারদের সাথে রোগীদের সাধারণত দেখা করতে অধিক সময় অপেক্ষা করতে হয়। এর কারণ হিসেবে ২৭.২ শতাংশ বলেন ডাক্তার সময়মতো আসেন না, ১০.৬ শতাংশ বলেছেন মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভদের উৎপাত এবং ৬২.২ শতাংশ অধিক রোগীর সমাগমকে কারণ বলে চিহ্নিত করেন।

ডাক্তারদের সময়মতো না পাওয়া প্রসঙ্গে সেবাগ্রহীতাগণ		
ডাক্তার সময়মতো আসেন না	মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভদের উৎপাত	অধিক রোগীর সমাগম
২৭.২%	১০.৬%	৬২.২%

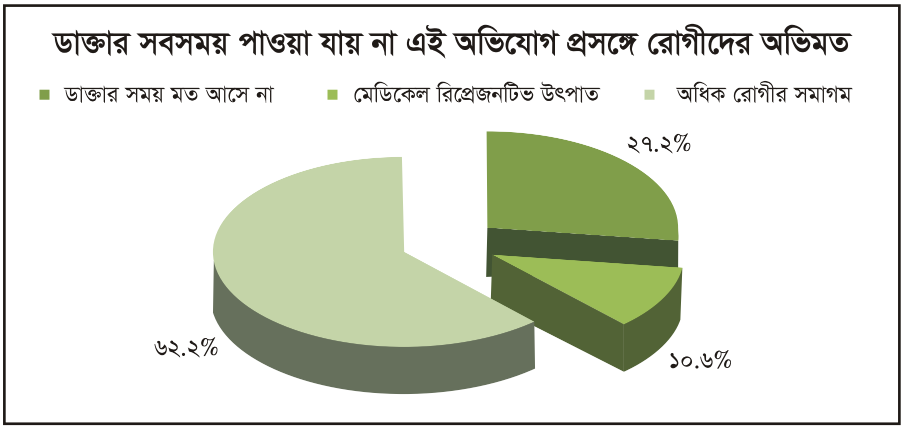

হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য নির্ধারিত ফি ব্যতীত অতিরিক্ত ফি দিতে হয়েছে বলে ১৭.৯ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেন এবং ৮৩.১ শতাংশ বলেছেন দিতে হয়নি। অতিরিক্ত ফি দিতে হয়েছে গার্ড, টেশনিশিয়ান, বয়, আয়া, দালালকে।

প্যাথলজি পরীক্ষায় ২৩.৮ শতাংশ সন্তুষ্ট, ৪২.১ শতাংশ অল্প সন্তুষ্ট এবং ২৯.৬ শতাংশ অসন্তুষ্ট বলে উল্লেখ করেন।

প্যাথলজি পরীক্ষায় সেবাগ্রহীতাগণের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি		
সন্তুষ্ট	অল্প সন্তুষ্ট	অসন্তুষ্ট
২৫.৮%	৪৩.২%	৩১%

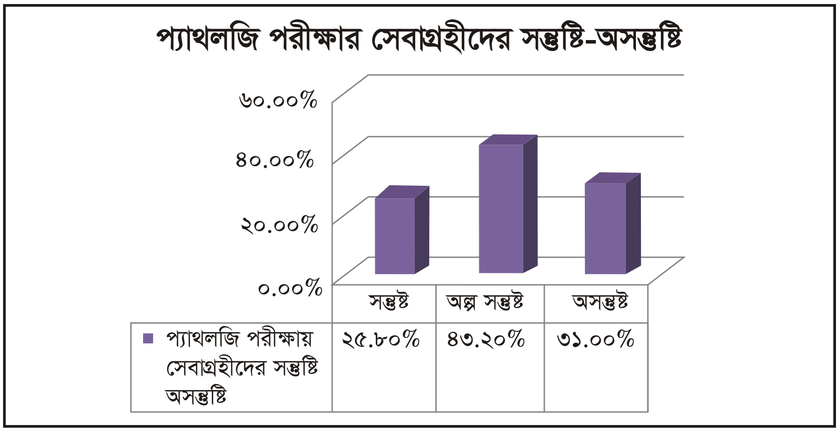

ওয়ার্ডে খাবারের মান নিয়ে ১৮.৪ শতাংশ সন্তুষ্টি, ৫২.৭ শতাংশ অল্প সন্তুষ্টি এবং ২৭.৬ শতাংশ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। ওয়ার্ডে খাবারের পরিমাণ নিয়ে ২০.৩ শতাংশ সন্তুষ্ট, ৫১.৪ শতাংশ অল্প সন্তুষ্টি এবং ২৭.৩ শতাংশ অসন্তুষ্ট বলে জানান।

ওয়ার্ডে খাবারের মান এবং পরিমান নিয়ে সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি

	সন্তুষ্ট	অল্প সন্তুষ্ট	অসন্তুষ্ট
খাবারের মান	১৮.৪%	৫২.৭%	২৭.৬%
খাবারের পরিমান	২০.৩%	৫১.৪%	২৭.৩%

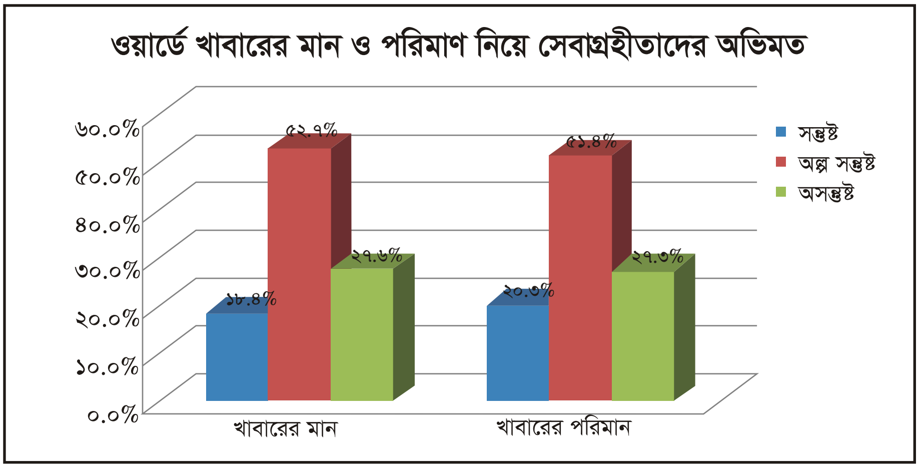

হাসপাতালের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিয়ে ৪১.৩ শতাংশ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ৫০.৬ শতাংশ। হাসপাতালের যন্ত্রপাতি নিয়ে ৫১.৪ শতাংশ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণের স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশঃ

জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও কমিউনিটি পর্যায়ে রোগী, ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান, হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারি, রোগীর অভিভাবক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, স্থানীয় জনসাধারণ ও ভুক্তভোগীদের সাথে আলোচনা করে যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশ পাওয়া গেছে তা হলো:

- জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য হারে বরাদ্দ বাড়ানো;
- সকল শূন্যপদ পূরণসহ নারী স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দান। কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে অন্তত ১জন করে পরিছন্নতা কর্মী নিয়োগ দেয়া। সর্বোপরি জনবল বৃদ্ধিকরা;
- প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে মনিটরিং প্রক্রিয়া আরো জোরদার করা;
- কমিউনিটি গ্রুপের স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিকে উপজেলা স্বাস্থ্য বিষয়ক সমন্বয় কমিটির সদস্য করা। জরুরি ভিত্তিতে প্রস্তাবিত কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ নির্মাণ করাসহ ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা;

- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এমবিবিএস ডাক্তারের নিয়োগ এবং অবস্থান নিশ্চিত করা। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সকল শূন্যপদ পূরণসহ ১ জন গাইনি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেয়া বা গাইনিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাব এ্যাসিসট্যান্ট কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার (নারী) নিয়োগ দেয়া;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে একীভুত করে একই প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা;
- জেলা সদর হাসপাতালে সকল শূণ্যপদ পূরণসহ পর্যাপ্ত জনবল নিশ্চিত করা। গাইনি বিশেষজ্ঞ পদ বৃদ্ধি করা;
- অফিস চলাকালীন সময়ে ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার জন্য কার্যকর নীতিমালা তৈরী এবং তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। কর্মকালীন সময়ে কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাদের জন্য নির্ধারিত রুমে অনুপস্থিত থাকলে অনুপস্থিতির কারণ এবং কখন কর্মক্ষেত্রে ফিরবেন তা বহির্বিভাগে অপেক্ষারতসহ সব রোগীদের জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তথ্যকেন্দ্র স্থাপন। ঔষধের তালিকা নির্দিষ্ট স্থানে ঝুলানো ও হাসপাতালের বহির্বিভাগে ঔষধের তালিকার যে বোর্ড রয়েছে তা প্রতিদিন হালনাগাদ করা;
- ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের হাসপাতালে ডাক্তারদের কর্তব্যকালীন সময়ে প্রবেশ বন্ধ করা;
- রোগীদের অভিযোগ ও সুপারিশ জানানোর জন্য হাসপাতালে অভিযোগ বাক্স রাখা। রোগীদের অভিযোগ/সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তীতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ডাক্তার, নার্স ব্যতীত হাসপাতালের অন্যান্য কর্মচারিদের জন্য পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা যাতে সাধারণ মানুষ হাসপাতালের সংশ্লিষ্টদের চিনতে পারে এবং কে কোন পদে আছেন তা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেতে পারে;
- ‘সরকারি চিকিৎসা সেবা’ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ
- চিকিৎসকগণ প্রেসক্রিপশনে ঔষধের নাম না লিখে ঔষধের জেনেরিকের নাম লিখন
- চর, হাওড়, বাওড় ও পাহাড়ি এলাকায় চিকিৎসক, চিকিৎসা সেবা ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করা

চতুর্থ অধ্যায় ৪

উপসংহার

সরকারি স্বাস্থ্যসেবা ও প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতির একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরার জন্যই সুপ্র ২০ জেলায় সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে সকল নাগরিকের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার পাওয়া উচিত। প্রাথমিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বিদ্যমান দূর্বলতাসমূহ খুঁজে বের করে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার উৎকর্ষতা এবং শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মানোন্নয়নের উপায়সমূহ অনুসন্ধান করার পাশাপাশি বিদ্যমান সরকারি সেবা সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরিই এই সামাজিক নিরীক্ষার উদ্দেশ্য। সর্বোপরি সুপ্র আশা করে, জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

সামাজিক নিরীক্ষা ২০১১ সম্পন্ন করার জন্য সুপ্র নেটওয়ার্কভূক্ত ২০ জেলায় যারা সহযোগিতা করেছেন-

জেলার নাম	সংস্থা	জেলা সম্পাদক	জেলা ক্যাম্পেইন সহায়ক
কুমিল্লা	**দর্পন** বায়তুল আমান, বাড়ি- ১০০, ৪র্থ তলা, বাগিচাগাঁও, কুমিল্লা- ৩৫০০	মাহবুব মোর্শেদ	লুৎফুন নাহার রাখী
কুষ্টিয়া	**জ্যোতি ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন** ৩৫, ৩৬ জিকে কম্পাউন্ড, থানাপাড়া, কুষ্টিয়া	সৈয়দা হাবিবা	অঞ্জন কৃষ্ণ শীল
কুড়িগ্রাম	**সলিডারিটি** নুতন শহর, কুড়িগ্রাম	নাজমুন নাহার সুইটি	প্রফুল্ল কুমার রায়
চট্টগ্রাম	**ইপসা** বাড়ি- এফ ১০ (পি), রোড-১৩, ব্লক-বি, চাঁদগাঁও আ/এ, বদ্দারহাট, চট্টগ্রাম	আরিফুর রহমান	সানজিদা আকতার
চুয়াডাঙ্গা	**রিসো** এসপি অফিস লেন, চুয়াডাঙ্গা-৭২০০	জাহিদুল ইসলাম	দারুল ইসলাম
ঝিনাইদহ	**ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই)** বাড়ি- ১১১, শেরে বাংলা রোড, ঝিনাইদহ- ৭৩০০	শরীফা খাতুন	রাফেজা পারভীন
টাঙ্গাইল	**স্মরণী (মানব উন্নয়ন সংস্থা)** বিশ্বাস বেতকা, ঢাকা রোড, টাঙ্গাইল	মঞ্জু রাণী প্রামাণিক	খোন্দকার মিজানুর রহমান
দিনাজপুর	**কাম টু ওয়ার্ক** মন্মথপুর, পার্বতী পুর, দিনাজপুর	মতিউর রহমান	মোঃ মোকররম হোসেন মানিক
নাটোর	**পিকেএসএস** সিংড়া, নাটোর	ডেইজি আহমেদ	মোঃ রাজু আহমেদ
নেত্রকোনা	**স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি** শিবগঞ্জ রোড, নেত্রকোনা ২৪০০	বেগম রোকেয়া	মোঃ আলমগীর

জেলার নাম	সংস্থা	জেলা সম্পাদক	জেলা ক্যাম্পেইন সহায়ক
পাবনা	**পাবনা প্রগতি সংস্থা** স্কয়ার রোড, শালগাড়িয়া পাবনা	এম এ ছালাম	মোঃ দেলোয়ার হোসেন
বগুড়া	**পেভ** ভাটরা চৌধুরি হাউস, গোহাইল রোড, খান্ডার, বগুড়া -৫৮২০	কেজিএম ফারুক	সাকিনা আকতার
বরগুনা	**জাগো নারী** কলেজ রোড, বরগুনা ৮৭০০	হোসনে আরা হাসি	মোঃ জহিরুল ইসলাম
ময়মনসিংহ	**ভয়েস** ৮ জিকেএমসি, শাহা রোড, ছোট বাজার, ময়মনসিংহ	আহমেদ স্বপন মাহমুদ	সজল কোরায়শী
রাজবাড়ী	**এস বি ইউ এম এস** বাসা ১, সড়ক ১, বেড়াডাঙ্গা, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী	শামীমা আকতার মুনমুন	মোঃ ইদ্রিস আলী সরদার
রাজশাহী	**স্ব-উন্নয়ন** বাড়ী নং-২১৫, সুলতানাবাদ, ঘোড়ামারা, রাজশাহী ৬১০০	হাসান মিল্লাত	তাহেরা খাতুন
রাঙ্গামাটি	**সাস** কল্যাণপুর এলাকা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা -৪৫০০	ললিত সি চাকমা	মোঃ ইকবাল বাহার মারুফ
শরীয়তপুর	**এস ডি ও** পালং, সদর রোড, শরীয়তপুর	মাহবুবুর রহমান	মোঃ আতাহার হোসেন
সাতক্ষীরা	**স্বদেশ** রাইচরণ রোড, টাউন বাজার সাতক্ষীরা-৯৪০০	মাধব চন্দ্র দত্ত	ফারুক রহমান